‘ঢাকা প্রকাশ’-এ প্রতিফলিত ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবন

The Cultural Life of Women in Dhaka : Reflections from ‘Dhaka Prokash’

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

ফারহানা সিদ্দিকী

রেজিঃ ১৭১

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুরাইয়া আক্তার

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ, ২০২৫

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **'ঢাকা প্রকাশ'**-এ প্রতিফলিত ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবন (The Cultural Life of Women in Dhaka : Reflections from 'Dhaka Prokash') শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ (থিসিস)টি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সুরাইয়া আক্তার-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একটি একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভ (থিসিস)টির সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্ধর্ভে (থিসিসে) কোন Plagiarism (অন্যের লেখা আমার নিজের বলে চালানো) নেই।

তারিখ, ঢাকা
মার্চ, ২০২৫ খ্রি.

Farhana
16.03.2025

(ফারহানা সিদ্দিকী)
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ ১৭১
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৩৩০

Department of Islamic History & Culture
University of Dhaka
Dhaka 1000
Phone: 9661900-73/6330
Email : ihc@du.ac.bd

নং:.....

তারিখ: ২৬ মার্চ ২০২৫

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব ফারহানা সিদ্দিকী কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **'ঢাকা প্রকাশ'**-এ প্রতিফলিত ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবন (The cultural Life of Women in Dhaka: Reflections from 'Dhaka Prokash') শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ (থিসিস)টি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের (থিসিসের) সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভ (থিসিস)টি আদ্যপ্রান্ত পাঠ করেছি এবং এটি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোনো প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

তারিখ, ঢাকা
মার্চ, ২০২৫ খ্রি.

(ড. সুরাইয়া আক্তার)
অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে পড়ালেখা করার সুবাদে সিলেবাসভুক্ত নারী ও ইসলাম বিষয়ক কোর্সটি আমি অধ্যয়ন করেছিলাম। তখন থেকেই নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে গবেষণা করার জন্য অনুপ্রাণিত হই। আমরা জানি, এ যাবৎ প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারীর জীবনাচার নিয়ে নানাধরনের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড গবেষণা হয়েছে। কিন্তু নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক গবেষণা আমাদের জানামতে আজ পর্যন্ত হয়নি। এ অভিপ্রায়ে তৎকালীন ঢাকার নারীসমাজের চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ও মুখপাত্র হিসেবে *ঢাকা প্রকাশ*'কে আমি বেছে নিয়েছি। অর্থাৎ আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে **'ঢাকা প্রকাশ'-এ প্রতিফলিত ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবন**। এই গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য আমি প্রথমেই পরম করুণাময় মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মতো শক্তি আমাকে দিয়েছেন। আমার এ গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সুরাইয়া আক্তার, যাঁর সক্রিয় সহযোগিতা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা ছাড়া এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির আদ্যপ্রান্ত পড়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং সকল ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও এমফিল গবেষণার প্রথম বর্ষে বিভাগীয় যেসব শিক্ষক শ্রেণি পাঠদান করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একইসাথে আমার বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকরাও গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। বিভাগের সারোয়ার ভাইসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমাকে সবরকম তথ্য দিয়ে অনেক সাহায্য করেছেন তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অফিসের এম.ফিল সেকশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দাপ্তরিক কাজে সহযোগিতা করেছেন বিধায় তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে আমি এই গবেষণার উপাদান সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পত্রিকা সেকশনের ডিজিটাল সংস্করণ থেকে বহু তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনেকেই আমাকে অনেক বেশি সাহায্য করেছেন। তারা আমাকে ডিজিটাল সংস্করণ দেখতে এবং খুব দ্রুত সময়ে তা ফটোকপি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সকলের ব্যবহারই আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি তাদের সবার কাছেই কৃতজ্ঞ। আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন রিদ্ধি মাল্টিকালার প্রিন্টিং প্রেসের ম্যানেজার জনাব মো. জাহাঙ্গীর হোসেন। তার প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি দীর্ঘ দিন যাবত হাবীবুল্লাহ্ বাহার কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছি। এ কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও বিভাগীয় সহকর্মীবৃন্দ বিভিন্নভাবে আমার গবেষণা কাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার একমাত্র মেয়ের বাবা এবং আমার সহধর্মী এ. কে. এম. শফিকুল হক-এর প্রতি। তিনি আমাকে দীর্ঘ এই গবেষণা কার্যে অনেক বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমার বাবা-মা এবং বড় বোন সুইটি ও ছোট বোন যুথীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের অনুপ্রেরণাতেই সম্ভব হয়েছে এই গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করা। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার তিন বছরের মেয়ের প্রতি এবং সেইসাথে ক্ষমাও চাচ্ছি কারণ, দীর্ঘ সময় মেয়েকে বাসায় একা রেখে আমার পড়ালেখার জন্য লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন করতে হয়েছে। অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে অবশেষে এই গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করেছি। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ফারহানা সিদ্দিকী
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ ১৭১
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

গবেষণার শিরোনাম

‘ঢাকা প্রকাশ’-এ প্রতিফলিত ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবন

The Cultural Life of Women in Dhaka : Reflections from ‘Dhaka Prokash’

গবেষক

ফারহানা সিদ্দিকী

রেজিঃ ১৭১

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ, ২০২৫

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

গবেষণার শিরোনাম

‘ঢাকা প্রকাশ’-এ প্রতিফলিত ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবন

The Cultural Life of Women in Dhaka : Reflections from ‘Dhaka Prokash’

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা। এটি বাংলা তারিখ ২৫ ফাল্গুন, ১২৬৭ বঙ্গাব্দ (মার্চ ৭, ১৮৬১ খ্রি.) প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ প্রকাশিত হলেও প্রাচীনত্বের কারণে ১৮৬৩ সাল থেকে এটির কপি পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই পত্রিকার ডিজিটাল সংস্করন যা ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রয়েছে। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা এতই বেশি ছিল যে, এটি প্রায় (১০০) বছর টিকে ছিল। একদম শুরুতে এর প্রচার সংখ্যা ছিল ২৫০ এবং হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আন্দোলনের পরে এর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৫০০০। সরকারও এই পত্রিকাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিত। সাময়িক পত্র এবং নারীসমাজ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হলেও *ঢাকা প্রকাশ* এ প্রতিফলিত ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস নিয়ে এখনো কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। ইতিহাসের এই অসম্পূর্ণতা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস রচনা করার প্রয়াস আমি পেয়েছি। ঢাকায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে যে আধুনিকতা ও নব পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম নিদর্শন হলো খবরের কাগজের প্রকাশনা। প্রথমে ইংরেজি ও পরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলো মূলত তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের দৈনন্দিন জীবনের তথ্যভিত্তিক জ্ঞান তৃষ্ণার খোরাক জোগাতো। সমাজের শিক্ষিত বিত্তশালীরা এ কাজে অর্থলগ্নি করতো। *ঢাকা প্রকাশ* শুরুতে ব্রাহ্মদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, এরপরে রক্ষণশীল হিন্দুদের এবং সবশেষে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তানের বিভক্তির পরে ঢাকা হয় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। এ সময় পত্রিকার মালিকানা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে যায়। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা যে মুদ্রণযন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয় তার নাম বাঙ্গালা যন্ত্র। এই যন্ত্র থেকে শুধু *ঢাকা প্রকাশ* না অন্যান্য আরো বইপত্রও মুদ্রণ করা হয়েছিল। এ পত্রিকার সম্পাদনার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দীননাথ সেন, জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী, গোবিন্দপ্রসাদ মৌলিক, গুরুগঙ্গা আইচ, মুকুন্দবিহারী চক্রবর্তী, রাধারমন ঘোষ এবং আব্দুর রশিদ খান, যিনি মুসলিম ধর্মের ছিলেন। এ পত্রিকার মালিকানা হাত

Dhaka University Institutional Repository

বদলের সাথে সাথে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় সমকালীন অন্যান্য সংবাদের পাশাপাশি দীর্ঘকাল ধরে নারীর জীবনের বিভিন্ন দিকও উঠে এসেছে গুরুত্বের সাথে। পত্রিকায় তৎকালীন ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের পাশাপাশি নারীর সংস্কৃতির ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাসও উঠে এসেছে। আমার এই অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ভূমিকা। যেখানে গবেষণার যৌক্তিকতা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, সময়কাল ও পদ্ধতিও আলোচনা করা হয়েছে এখানে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে *ঢাকা প্রকাশের* পরিচয় ও নারী প্রসঙ্গ। এখানে *ঢাকা প্রকাশের* পরিচয়ের পাশাপাশি পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে একদম শেষ পর্যন্ত এর ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস এবং এর সম্পাদনার সাথে যারা জড়িত ছিলেন, ধর্মগত প্রভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। পত্রিকায় নারীরা উপস্থাপিত বিষয় হিসেবে কিভাবে উঠে এসেছে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে তৎকালীন ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস। এখানে সে সময়ের (১৮৬৩-১৯৫৯ খ্রি.) নারীদের জীবনের চিত্র *ঢাকা প্রকাশের* আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। তারা যে সকল ধর্মবিশ্বাস থেকে নানা রকম লোকাচার পালন করতো সেগুলোও উঠে এসেছে এখানে। শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম, নাচ, গান এবং নাটকে নারীর অংশগ্রহণের ধরণ এসব কিছুই উঠে এসেছে এখানে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে নারী বিষয়ক খবরের ধরন, বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র্য। *ঢাকা প্রকাশে* যে ধরনের নারী বিষয়ক খবর বেশি পরিমাণে উঠে এসেছে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে এখানে। নির্যাতনমূলক খবরের আধিক্য বিবেচনায় সেগুলোর আবার শ্রেণিবিভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। খবরের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্যতাও তুলে ধরা হয়েছে। নির্যাতনমূলক খবরের পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি, সরকারি পদক্ষেপ, রাজনীতিতে অবদান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, যেমন- নাচ, গান, নাটক ইত্যাদিও উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে উপসংহার। যেখানে সম্পূর্ণ গবেষণার সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে।

এই গবেষণার সময় হচ্ছে **১৮৬৩** থেকে **১৯৫৯** খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই গবেষণা কর্মটি বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত পত্রিকা নির্ভর এবং পত্রিকাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত থাকায় বর্তমান গবেষণা কাজের জন্য এখানে রক্ষিত *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার ডিজিটাল সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় দ্বৈতয়িক উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এজন্য উৎস হিসেবে *ঢাকা প্রকাশ* ছাড়াও আরো অন্যান্য সাময়িক পত্র, বইপুস্তক, প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারও অনুসরণ করা হয়েছে। আমার এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে *ঢাকা প্রকাশ* সাময়িক পত্রে নারীর সাংস্কৃতিক জীবনকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করা। শিক্ষার আলো কিভাবে নারীদের সংস্কৃতি চর্চায় ভূমিকা রেখেছে তা তুলে ধরা। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হলে এই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল *ঢাকা প্রকাশের* আলোকে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। পত্রিকায় অনেক নারীচিত্র সংবলিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হতো সেগুলোকে উদাহরণসহ সংযোজন করা হয়েছে এই অভিসন্ধর্ভে।

পরিশেষে বলা যায় যে, *ঢাকা প্রকাশ* সাময়িক পত্রের আলোকে তৎকালীন নারীর সাংস্কৃতিক জীবন নির্বাচনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে তৎকালীন ঢাকার নারীদের জীবনযাপন, তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং নারীজীবনের ক্রমবিবর্তনের ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে এই গবেষণায়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
সারসংক্ষেপ	ii - iv
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	১ - ১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ঢাকা প্রকাশের পরিচয় ও নারী প্রসঙ্গ	২০ - ৪৮
তৃতীয় অধ্যায়	
তৎকালীন ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়	৪৯ - ৭২
চতুর্থ অধ্যায়	
নারী বিষয়ক খবরের ধরন, বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র্য	৭৩ - ১০৯
পঞ্চম অধ্যায়	
উপসংহার	১১০ - ১১৪
গ্রন্থপঞ্জি	১১৫ - ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর কর্মপ্রক্রিয়া বিস্তার লাভ করলেও একাডেমিক সিলেবাসের আওতায় নারীকে স্থান পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। সমাজে নারীর ভূমিকা অবমূল্যায়িতই রয়ে গেছে যুগের পর যুগ ধরে। নারীর ভূমিকা মূল্যায়ন করে তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করার পূর্বে তাদের নিয়ে ইতিহাস রচনা সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র স্থানীয় আচার, অনুষ্ঠান, পোশাক পরিচ্ছদ তথা সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যেই।[১] ইংরেজি কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি শব্দটি ১৯২২ সালে বাংলায় প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয়। সংস্কৃতির সাধারণ সংজ্ঞা হলো কোনো স্থানের মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো টিকে থাকার কৌশল। সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বিজ্ঞানী টেইলর সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত নানা আচরণ, যোগ্যতা এবং জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি, আদর্শ, প্রথা ইত্যাদির এক যৌগিক সমন্বয়কে সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করেন। মেলিনস্কি সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন আরও সরল ভাষায়, তিনি মনে করেন সংস্কৃতি হলো মানবসৃষ্ট এমন সব কৌশল বা উপায় যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে।

আর আধুনিকতার প্রসঙ্গ সব সময়ই আধুনিক বা নতুন; তা কখনোই পুরাতন হয় না। যতদিন মানব সভ্যতা থাকবে, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন আধুনিকতাও থাকবে। তবে আধুনিকতার প্রথম ও অনিবার্য শর্তটি হলো সচেতনতা। আধুনিক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'অধুনা' থেকে, যার অর্থ হলো সমসাময়িক। ইংরেজি মডার্নিজম বা আধুনিকতা হলো একটি ধারণা যা মানব সংস্কৃতির চলমান প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সাধন করে। তাই সংস্কৃতি ও আধুনিকতা বহমান। তবে কালপর্ব কিছু বিশেষত্ব ধারণ করেই অগ্রসরমান হয়, যাকে আদিম, আধুনিক কিংবা উত্তরাধুনিক নামে বিশেষায়িত করা হয়।

তাত্ত্বিকভাবে আধুনিকতার সূচনা হয় ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, রেনেসাঁ এবং চীনের শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। যার মাধ্যমে আধুনিকতার নিজস্ব ধারণার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আধুনিকতার এই চলমান প্রক্রিয়ায় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের অধীনতা ছেড়ে

[১] সুরাইয়া আক্তার, *বিনত বিবি থেকে পরিবিবি : ঢাকার স্থাপত্যে নারীর ইতিহাসের স্বরূপ অনুসন্ধান।*

Dhaka University Institutional Repository

দলিত ও নিম্নবর্গের ভাষ্য ধারণে সক্ষম হয়েছে নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র ইতিহাস লিখনে। আধুনিকতা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সোচ্চার ভূমিকা পালন করে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্রসমূহ। সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়। এরা সাধারণত আধুনিকতার অনুকরণ করতে থাকে পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহের কাছ থেকে এবং এই আধুনিকতা ও উন্নয়নের অন্যতম বিষয় হিসেবে নারী এবং পুরুষের মধ্যকার রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের কথা বলতে গেলে জেন্ডার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায়। নারীসমাজের পরিবর্তনের এই প্রশ্নে সারা পৃথিবী যেন একদিকে আর অন্যদিকে নারীসমাজ, এই দুই মিলে শক্তিশালী দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়।[২]

নারী নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে জেন্ডার নিয়ে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক, কেননা এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নারী। কোনো বিশেষ্য বা বিশেষ্যবাচক লিঙ্গ বা লিঙ্গহীনতা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয় জেন্ডার। সাধারণত ব্যাকরণে জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, ক্লিবলিঙ্গ ইত্যাদি চিহ্নিত করতে। কিন্তু ভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়। সমাজবিজ্ঞানীরা জেন্ডার শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে অবস্থিত নারী ও পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যকে নির্দেশ করে থাকেন। এর দ্বারা একটি নারী এবং পুরুষের পরিচয় বা কার্য নির্দেশিত হয়। সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা, কর্ম, দায়িত্ব, আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রচলিত জেন্ডার সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ কোমল হৃদয়, আবেগপ্রবণ, শান্ত, নম্র এ সকল বিশেষণের অধিকারিণী হবে নারীরা; অপরদিকে কঠোর এবং যুক্তিবাদী সংমিশ্রণ থাকবে পুরুষের মধ্যে এটাই আমাদের সমাজের প্রচলিত জেন্ডার ধারণা।

এছাড়াও সমাজে নারী ও পুরুষের কাজ নির্ধারণ করে জেন্ডার। যেমন- রান্নাবান্না, সন্তান লালনপালনসহ ঘরের কাজ হলো নারীর কাজ। আর পুরুষের কাজ হচ্ছে আয় উপার্জন, বিচার সালিশ, রাজনীতি ইত্যাদি বাইরের কাজসমূহ। কিন্তু সময়, কাল এবং সংস্কৃতিভেদে এ বিষয়গুলো বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের নারী-পুরুষ এবং ইউরোপীয় কোনো নারী-পুরুষের মধ্যে তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি। বাহ্যিকভাবে এরা দেখতে অনেকটাই একই রকম হলেও কাজকর্ম, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। আর এ বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়েছে একদমই যার যার সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে। তাই সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই এ সকল অর্পিত নারী-পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, আচরণ, ভূমিকা, সংস্কৃতি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে।

---

[২] সুরাইয়া আক্তার, *নারী ও ইসলাম*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়ে বা নারী এই শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে একটা নির্দিষ্ট লিঙ্গকে বোঝানো হয়। কিন্তু মেয়েলি শব্দটি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট জেন্ডারকে বোঝানো হয় যা একজন নারীর লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে অন্য কিছু প্রকাশ করে, যা কি-না আমাদের সমাজ কর্তৃক তৈরি হয়েছে যুগে যুগে, কালে কালে। কিন্তু কখনোই তা শুধুমাত্র লিঙ্গের পরিণতি নয়, কেননা একজন নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যই শুধুমাত্র তার সারা জীবন গৃহকর্মে কাজ করার কারণ হতে পারে না, কিংবা এর জন্য তার বাইরের কাজে অংশগ্রহণেও কোনো বাধা নেই। একইভাবে একজন পুরুষের গৃহকর্মে কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য কখনোই বাধা হতে পারে না। এ বাধা সৃষ্টি করেছে সমাজ, যা কি-না নারী এবং পুরুষের দায়িত্ব, আচরণ, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদিকে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে রেখেছে আর এটি মূলত জেন্ডার হিসেবে অভিহিত। তাই জেন্ডার বলতে আমরা বুঝি নারী-পুরুষের স্বতন্ত্রতা যা সমাজের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।

জেন্ডার এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নারী। বর্তমান সময়ে নারীর সমস্যা এবং নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা গবেষণায় গুরুত্ব পাচ্ছে। এখন এই গবেষণাগুলো ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাতে এই ধারণার বহিঃপ্রকাশ অনেক পরে দেখা গেলেও ইউরোপে এমন ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল ১৫ শতকের শুরুর দিকে। বাংলায় নারীদের উন্নয়নের জন্য চিন্তাভাবনা এবং তাদের এই করুণ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়াস চালানো হয় ১৯ শতকের শুরুর দিকে। এই গবেষণা মোটেও সহজসাধ্য বিষয় ছিল না, পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নারীসমাজকে। এই প্রচেষ্টা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। বের হয়ে পড়েছিল সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে নারীরা কতটা নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে এবং এই নির্যাতন ও বৈষম্যের চিত্র শুধুমাত্র বাংলায় ছিল বিষয়টা তেমন নয়, সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা সবখানেই ছিল এই একই রকম চিত্র। সকল রকম পরিবেশে, সকল রকম ধর্মে এমনকি সকল শ্রেণির নারীরাই নির্বিশেষে যার যার অবস্থান থেকে নির্যাতনের শিকার হয়েছে।[৩]

নারীদের করুণ অবস্থার ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় প্রাচীন চীন দেশের নারীদের জীবনী থেকে। সেসময় নারীদের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর বিয়ের আগেই সেই হবু বধূকে শ্বশুর বাড়িতে কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ার জন্য তিন মাস অবস্থান করতে হতো। সমাজে তারা কতটা অবহেলিত হলে তাদের জন্য এমন ব্যবস্থা থাকতে পারে। চীনের মতো রোমের নারীদের অবস্থাও ছিল করুণ। দাসতন্ত্রের চরম নির্যাতনের শিকার ছিল প্রাচীন রোমের নারীরা । একাধিক পুরুষের অঙ্গশায়িনী হওয়ার অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ক্লিওপেট্রার মতো সাহসী শাসকও

[৩] জেন্ডার ট্রেনিং মডিউল; *এসোড ফ্লাট রেজিলিয়েন্স প্রকল্প*, রংপুর, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন।[৪] আর গ্রিসে যখন চরম গণতন্ত্রের যুগ, সে সময়ও পায়নি নারীরা ন্যূনতম নাগরিক অধিকার পর্যন্ত। তারা ছিল শুধুমাত্র ক্রীতদাসস্বরূপ এবং বৈধ সন্তান দাত্রীস্বরূপ। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর বক্তব্য থেকেও নারীজাতির করুণ অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এরিস্টটলও ছিলেন নারীর উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ, যা তার বিভিন্ন ভাষ্য থেকে বোঝা যায়।

নারীদের এই করুণ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আধুনিক যুগে কেউ কেউ এগিয়ে আসেন এবং ভূমিকা পালন করেন। নারীদের মধ্য থেকেই প্রথমে উদ্যোগ নেয়া হয়। ফরাসি লেখিকা ক্রিস্টিন দ্য পিজান (Christine de Pizan) নারীদের সমঅধিকারের বিষয়টি সামনে আনেন ১৪০২ সালে। এ সময় তিনি একটি গ্রন্থ লেখার মাধ্যমে নারীদের নির্যাতন ও বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথ নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম ছিল *The Tale of the Roses*। তার এই গ্রন্থটি ছিল জনপ্রিয় লেখক 'Jean The Meuns' এর লেখা গ্রন্থ '*Romance of the Roses*' এর তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ। ক্রিস্টিন তার গ্রন্থের মাধ্যমে তুলে ধরেন Meuns এর নারী বিদ্বেষিতাপূর্ণ মনোভাব এবং নারীদের প্রতি তিনি কতটা বিরূপ ছিলেন সেগুলো। তিনি সমাজে নারীদের অবদানের চিত্র তুলে ধরার জন্য ১৪০৫ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Book of The City of Ladies' রচনা করেন। সেখানে তিনি অনেক জ্ঞানীগুণী নারীদের চিত্র তুলে ধরেছেন এবং অতীতকালে যে সকল নারীরা পুরুষের সমকক্ষ তো বটেই এমনকি তাদের চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক বেশি অবদান রেখেছেন, সেগুলো তিনি চমৎকারভাবে গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। যে গ্রন্থ পাঠ করে নারীরা তাদের অবনত অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে সে সময় নারীরা স্বপ্ন দেখতে পারত না, তারা যে অনেক কিছু করতে পারে এই বিশ্বাস আনার জন্য এ সকল গ্রন্থ ভূমিকা পালন করেছিল।

পরবর্তীতে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে মেয়েদের শিক্ষাসহ অন্যান্য সকল অধিকারের দাবি তুলে ঝড় উঠেছিল। পিজানের অনুসরণ করে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা পুরুষের সাথে সাথে তাদের জন্য সমান শিক্ষার দাবি জানানোর সাহস করতে থাকে এবং এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি শুরু করেন। কিন্তু সে দাবি দাবিই রয়ে যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী। ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় তাদের সেই স্বপ্ন।

তৎপরবর্তীকালে ইউরোপে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল সে পরিবর্তনের জোয়ারে নারীরাও ভেসে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ সমাজের বৈপরীত্য

[৪] আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. - আট।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র। নারীসমাজের উন্নয়ন এবং শিক্ষা লাভ, সামাজিক মর্যাদা বর্তমান সময়ে অনেকটা সহজলভ্য করার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ কালের বঞ্চনা ও ত্যাগের ইতিহাস। ইংরেজ লেখিকা মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট (Mary Wollstonecraft) নারীদের উন্নয়নের দাবিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন সেসময়। তিনি নারী অধিকার নিয়ে বিস্তারিত একটি গ্রন্থ লিখেন *ভিনডিকেশন অব দি রাইটস অব ওমেন* (*A Vindication of the Rights of Women*) নামে। নারীদের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে এই গ্রন্থে। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন নারীত্ব শব্দটা নারীকে সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া একটি বোঝাস্বরূপ। আসলে নারীত্ব বলে কিছু নেই, এটা শুধুমাত্র আমাদের সমাজের সৃষ্টি। একটি নারীকে ছোটবেলা থেকে এই ধারণার শিক্ষা দেয়া হয়, যাতে সে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জন করতে পারে এবং পুরুষের অধীনস্থ না থাকে। ফরাসি বিপ্লবকালে ১৭৯২ সালে লেখিকার নারী পুরুষের ন্যায় পরিবার ও সমাজে সমঅধিকারের বিষয়টি সামনে আনার পরে তার পথ ধরে নারীর জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকলো। প্রয়োজন হলো বের করে আনা কিভাবে নারীরা সমাজে ও সভ্যতায় তাদের অবদান রেখেছেন এবং ইতিহাসের বিভিন্ন অভিঘাত নারীর জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে। সামাজিক ইতিহাস লিখনে নারীর যাপিত জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ে শুরু হয়েছে ইতিহাস লিখনের নতুন ধারা।[৫]

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শাসন হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণত একটি দেশ তথা একটি জাতির উপর অন্য দেশ বা জাতির যুদ্ধের দ্বারা বা বাণিজ্যিক কৌশলের মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করা। সাধারণত কোনো বিদেশি শক্তি কোনো দেশ দখল করে শাসন প্রতিষ্ঠা করলেই তাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা যায় না। ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আসা না তারা জানে একদিন তাদের এই শাসন গুটিয়ে চলে যেতে হবে, তাই যতদিন শাসক হিসেবে থাকবে ততদিন সেই দেশের ধন-সম্পদ নিজ দেশে পাচার করবে। তারপর যখন তাদের শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে বা অন্য কোনো কারণে শাসন করা সুবিধাজনক মনে হবে না, তখন তারা ফিরে যাবে নিজ দেশে। এভাবে অন্য কোনো দেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলে।[৬]

বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আগমন চলছিল অনেকদিন থেকে। এদের মধ্য থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সবার থেকে এগিয়ে যায় এ প্রতিযোগিতায়। ১৭৫৭ সালে

[৫] সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. আট - নয়।

[৬] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার নবাব সিরাজউদৌলাকে পরাজিত করে তারা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে। এভাবে ১৭৫৭ সাল থেকে বাংলাদেশে ব্রিটিশ বা ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার ইতিহাসে এই যুগটি ঔপনিবেশিক যুগ নামে পরিচিত। বাংলায় ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল অব্দি যে শাসন চলে তাই ঔপনিবেশিক শাসন।

ঔপনিবেশিক বাংলার নারীরা তখন কেমন ছিল? ঔপনিবেশিক শাসনামলে নারীবাদী ভাবনা বাংলায়ও বিস্তার লাভ করেছিল পাশ্চাত্যের অনুকরণে, কেননা তখন ব্রিটিশ শাসিত সমাজ ছিল তাই তাদের মধ্যকার অনেক ধ্যানধারণা বাংলার মানুষও গ্রহণ করেছিল। এ সময়ে পুরুষদের মধ্য থেকেই শুরু করেছিলেন নবজাগরণ। তাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় তার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ভলটেয়ার, রুশো, মিল, টমাস, পেইন প্রমুখও ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য। এরা সকলেই নারীদের অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাঙালি সমাজের মানবতা বিবর্জিত করুণ চিত্র তাদেরকে অনেক বেশি পীড়া দিয়েছিল। তাই তারা এ সকল বিষয়কে জনগণের সামনে নিয়ে এসে নারীদেরকে জাগরণের চেষ্টা করেন।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার নারী শিক্ষা ও সাহিত্যকর্মে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এবং তা ব্যাপকতা লাভ করে আশির দশক থেকে। এমনকি এই সময় নারীরা রাজনীতিতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এর আগ পর্যন্ত অগ্রগতির জন্য নারীরা পুরুষের মুখাপেক্ষী হলেও এবার তারা নিজ উদ্যোগে এবং নিজ কৃতিত্বে ভূমিকা রাখেন। নারীরা বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে অনগ্রসর নারীদেরকে সামনে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখাতে থাকেন। বিভিন্ন স্কুল এবং সভা সমিতি তারা স্থাপন করেন। নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে উৎসাহিত করা হয়। নারী সংগঠনগুলো সমাজের এই পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে নারীদের জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে থাকেন। এর প্রতিফলন পাওয়া যায় বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলো থেকে।

এই সময় নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখতে শুরু করেন। শুধুমাত্র মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার মধ্যেই তাদের জীবন সীমিত ছিল না, এমনকি সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের রেকর্ডও তারা করে ফেলেন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নারীরা শিক্ষিত হতে শুরু করে এবং তারা শুধুমাত্র শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতেও অনেক সচেতন হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭ সাল পরবর্তী ভারত পাকিস্তানের বিভক্তি নারীসমাজের ঐক্যবদ্ধ চেতনায় আঘাত করেছিল। এ সময়ের এই অচলাবস্থায় পশ্চিম বাংলার নারীরা অল্প সময়ের মধ্যেই সংকট কাটিয়ে উঠলেও পূর্ব বাংলার নারীদের অনেক বেশি সময় লেগে যায়। পূর্ব বাংলার স্কুলগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা ব্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

হারে কমতে থাকে এবং এই সুযোগে পাকিস্তানি শাসকচক্র স্কুল বন্ধের ব্যবস্থা করতে থাকে। তাদের এই অপচেষ্টায় আঘাত হানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, কারণ এ আন্দোলনে নারীরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে নারী নেতৃত্বের উত্থান ঘটান। যার ফলে নারীরা আবার মূল ধারায় ফিরে আসে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে অসংখ্য নারীর অগ্রযাত্রায় সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা খুব দৃঢ়ভাবে ভূমিকা রাখে। সে সময় নারীরা নিয়মিত এবং অনিয়মিত সব ধরনের সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক বিভিন্ন ধরনের সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেছেন। সব মিলিয়ে সেগুলোর সংখ্যা প্রায় ৫৯টি। এই সবগুলোই যে নারীর একার কৃতিত্ব, শুধুমাত্র তাদের একার উদ্যোগেই সম্পাদনা করেছিলেন বিষয়টি তেমনও নয়, তাদের সাথে পুরুষরাও ছিল যে কারণে তাদের এ পথে অগ্রসর হওয়া তুলনামূলক সহজ হয়েছিল। নারী প্রগতির ধারাকে গতিশীল করার উদ্দেশ্য নিয়েই এ সকল সাময়িক পত্রের যাত্রা হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে পত্রিকাগুলো সফলতা লাভ করেছিল দুর্দান্তভাবে।

অনেক বিলম্বিত হলেও একথা সত্য যে মুসলমান নারীরাও এই পথে সংযুক্ত হতে থাকে এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিতে থাকে। বাংলার রেনেসাঁর মাধ্যমে উনিশ শতকে শুরু হয়ে যায় নারীদের সমাজ এবং জীবনের এক নতুন অধ্যায়। রেনেসাঁর দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিগণ বাঙালি নারীদেরকে এই পরাধীনতার জগৎ থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকারে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে সে সময়কার ভিন্ন কিছু প্রথার বিরুদ্ধে তাদের সোচ্চার ভূমিকা আজকের সমাজে নারীদেরকে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে পেরেছে। সে সময়ের ঘৃণ্য প্রথাগুলো হচ্ছে সতীদাহ প্রথা, অবরোধ প্রথা, কুলীন প্রথা, বাল্য বিয়ে ইত্যাদি। সেই সাথে নারী শিক্ষা এবং বিধবাদের জন্য বিয়ের প্রচলনের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের এক নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে।

অবরোধের কঠিন বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল উনিশ শতকের বাঙালি নারীরা। সে সময় নারীরা কাজ করবে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে, পুরুষের অধীনতা থেকে স্বনির্ভর হবে এই বিষয়গুলো ছিল স্বপ্নের মতো। সেই স্বপ্নজাল ভেঙে নারীরা উনিশ শতকে অনেকটাই বাস্তব জীবনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য এই শতকের শেষের দিকে নিম্নশ্রেণির সাথে সাথে অনেক ভদ্র পরিবারের নারীরাও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় এবং আত্মসম্মান অর্জনে নিজেদের একটা পরিচয় তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে নারীরা বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত হতে শুরু করেন।[৭]

[৭] আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা, ২০২৩।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকে বাংলার সমাজে নারীর জীবন যখন ছিল পশ্চাৎপদ এবং বহু প্রতিকূলতার বেড়াজালে জর্জরিত, তখন সব রকম সামাজিক বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন এক বাঙালি নারী, যার নাম কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক।

[৮]

ছবি : কাদম্বিনী গাঙ্গুলি (১৮ জুলাই ১৮৬১ – ৩ অক্টোবর ১৯২৩)

আনন্দীবাঈ যশী নামে আরেকজন ভারতীয় নারী একই বছর অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে ডাক্তারি পাশ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "যদি না জাগে ললনা ভারত জাগে না জাগে না।" নারীরা এত অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েও তৎকালীন ভারতবর্ষে বা বাংলায় কয়েকজন নারী তাদের কাজ দিয়েই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। যেমন– সুলতানা রাজিয়া (১২০৫ – ১৫ অক্টোবর ১২৪০) , রানী দুর্গাবতী (৫ অক্টোবর ১৫২১ – ২৪ জুন ১৫৬৪), রানী লক্ষ্মীবাঈ (১৯ নভেম্বর ১৮২৮ – ১৮ জুন ১৮৫৮), মাতঙ্গিনী হাজরা (১৯ অক্টোবর ১৮৭০ – ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৪), সরোজিনী নাইডু (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ – ২ মার্চ ১৯৪৯), দেবী চৌধুরানী (মৃত্যু – ১৮৭৩), কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (১৮ জুলাই ১৮৬১ – ৩ অক্টোবর ১৯২৩), ইন্দিরা গাঙ্গুলী (১৯ নভেম্বর ১৯১৭ – ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (৫ মে ১৯১১ – ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২), বীণা দাস (২৪ আগস্ট ১৯১১ – ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৬), আশালতা সেন (৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ – ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬) আমাদের বিস্ময় হয়ে রয়েছেন। বাংলায় প্রথম শহিদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। নিজের জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা সূর্য্যসেনের সাথে সামিল হয়েছিলেন এই সূর্য্য কন্যা।[৯]

---

[৮] https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjDBMyaUnoHjBIlHHO76nzX4ihRAMKKr-C-J_Hf1reH6LOPnDYe2nXjWoGgC2P5nlCY9aXXU-sMya6leETsrJ2bw

[৯] সোনিয়া নিশাত আমিন, *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

[১০]

ছবি : প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রথম শহিদ নারী, ৫ মে ১৯১১ – ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২)

প্রাচীনকাল থেকে নারীরা বিভিন্নভাবে সংস্কৃতি চর্চা করছে। তাদের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, পর্দা প্রথা, স্বাস্থ্য এই সকল কিছুই সংস্কৃতির অংশ। আর এ আধুনিকতার সাথে সাথে নারীর সংস্কৃতি ও পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক ইতিহাস গবেষণায় ষাট এর দশক থেকে নারী নিয়ে গবেষণা চলছে। বাংলাদেশেও এ নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা চলছে। নারী আন্দোলন, নারী শিক্ষা, নারী রাজনীতি, সামাজিক জীবন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নানাবিধ গবেষণা পাওয়া যায়। এরই অংশ হিসেবে আমরা পাই ১৯ ও ২০ শতকের সাময়িক পত্রিকার ভিত্তিতে নারীর যাপিত জীবন।

নারী বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন সোনিয়া নিশাত আমিন।[১১] *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন (১৮৭৬ – ১৯৩৯)* নামে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। পাপড়ীন নাহার এর অনুবাদ করেন এবং প্রকাশ করে বাংলা একাডেমি। ১৯ শতাব্দীর শেষ থেকে বিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলার মুসলিম মেয়েদের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় এতে। এটি নারীর আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিষয়ক একটি গবেষণা গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার মুসলিম ভদ্র মহিলার উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার নারীরা কিভাবে অন্দরমহলের শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করলো সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তবে তিনি নারী শিক্ষা ও নারী আন্দোলন নিয়েও কাজ করেছেন।

---

[১০] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Original_Archived_photo_of_Pritilata_Waddedar.jpg/220px-Original_Archived_photo_of_Pritilata_Waddedar.jpg

[১১] Sonia Nishat Amin, *The World in Muslim Women in Colonial Bengal (1876 - 1939),* Brill Publication; 1996.

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র জনমত তৈরির একটি বলিষ্ঠ মাধ্যম। এটি নারীসমাজকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাময়িক পত্র এবং নারীসমাজ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। তার মধ্যে তাহমিনা আলম *বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজ* নিয়ে পিএইচডি গবেষণা করেন।[১২] এ গবেষণায় তিনি বাংলার বেশ কিছু সাময়িক পত্র নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন– ইসলাম প্রচারক, নবনূর, ধূমকেতু, শরীয়ত, সহচর, শিখা, বুলবুল ইত্যাদি। এ সকল সাময়িক পত্রের আলোকে তিনি মুসলিম নারীসমাজের অবস্থা তুলে ধরেছেন।

সাময়িক পত্রিকা নিয়ে আরেকটি গবেষণা করেছেন রোজিনা বেগম। তিনি *বেগম পত্রিকা এবং পূর্ব বাংলার নারী সমাজ (১৯৪৭-১৯৫৮)* শিরোনামে একটি গবেষণা করেছেন।[১৩] তিনি এতে সাধারণ নারীদের সাহিত্য রচনায় এবং নারী জাগরণে কিভাবে একটি পত্রিকা সাহায্য করে তা তুলে ধরেছেন। বাংলার মুসলমান মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকার মধ্যে *বেগম* পত্রিকাকে প্রথম বলা চলে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীসমাজের উন্নয়নে *বেগম* পত্রিকার ভূমিকা নিরূপণ করা হয়েছে। নারীর কল্যাণ সাধনই ছিল প্রচারের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করে থাকে। গবেষণা কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় *বাংলাদেশের সংবাদপত্রে নারী বিষয়ক খবর প্রকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য*।[১৪] বাংলাদেশের সংবাদপত্রে নারী বিষয়ক খবরের শ্রেণি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং নারী বিষয়ক যে খবরগুলো প্রকাশিত সেগুলো ইতিবাচক না নেতিবাচক তাও যাচাই করা হয়েছে।

আমার গবেষণার সময় কাল ১৮৬৩ থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ। কারণ *ঢাকা প্রকাশ* ১৮৬১ সালে প্রকাশ হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ১৮৬৩ সাল থেকে পাওয়া যায়, এজন্য সময়কাল ১৮৬৩ সাল থেকে ধরা হয়েছে। এ সময়ে আমরা যে সকল পত্রিকা পাই তার মধ্যে অন্যতম কিছু পত্রিকা হচ্ছে: *ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১), বঙ্গদর্শন (১৮৭২), ভারতী (১৮৭৭), সবুজপত্র (১৯১৪), কল্লোল (১৯২৩), লাঙ্গল (১৯২৫), পূর্বাশা (১৯৩৭), নবকল্লোল (১৯৫৯)* ইত্যাদি।

আমার আলোচ্য পত্রিকা *ঢাকা প্রকাশ* নিয়েও কিছু গবেষণা হয়েছে। তার মধ্যে ডক্টর মুনতাসির মামুন বলতে গেলে সর্বপ্রথম কাজ করেন। তার গ্রন্থের নাম ছিল *ঢাকা প্রকাশ ও পূর্ব বাংলার*

---

[১২] তাহমিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ* (১৯০০ থেকে ১৯৪৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮।

[১৩] রোজিনা বেগম, *বেগম পত্রিকা এবং পূর্ব বাংলার নারী সমাজ* (১৯৪৬ – ১৯৫৮) অপ্রকাশিত এম.ফিল গবেষণা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।

[১৪] বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-এর উদ্দ্যোগে, *বাংলাদেশের সংবাদপত্রে নারী বিষয়ক খবর প্রকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য*, প্রকাশনা বিভাগ, ঢাকা, মার্চ, ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ।[১৫] এটি জুলাই ১৯৭৭ সালে মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশ করে। এতে পূর্ব বাংলার সমাজের চিত্র *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা যেভাবে তুলে ধরেছিল তার বর্ণনা রয়েছে। মূলত এই গ্রন্থে দুই বছরের *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার রচনা অথবা সংবাদ সংকলিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল পাঠকদের পুরনো সাময়িক পত্র সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলা। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে রচনাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য সমিতির মুখপাত্র অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কর্তৃক সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢাকা প্রকাশ এবং নারী নিয়ে আরেকটি গবেষণা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আরিফা সুলতানা। তার বিষয় ছিল *ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় নারী বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও সংকলন*।[১৬] এটি ইউজিসি থেকে প্রকাশিত ২০১৩ সালের একটি প্রকল্প। এতে তিনি *ঢাকা প্রকাশ* থেকে নারী বিষয়ক অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং পরবর্তীতে *ঢাকা প্রকাশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন: প্রসঙ্গ নারী* শিরোনামে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন। এই আর্টিকেলটি স্থান পেয়েছে তার রচিত *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী* নামক গ্রন্থে।[১৭] যেটি প্রতীক প্রকাশনী ২০২৩ সালে প্রকাশ করে। এতে রাজনীতিতে নারীদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অংশগ্রহণের সকল ঘটনাবলী তিনি তুলে ধরেছেন। অন্দরমহল থেকে কিভাবে নারীরা বাইরে বের হয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল এবং এর পেছনে পুরুষের ভূমিকা ছিল কিনা এ সব কিছুই তিনি এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা নিয়ে একটি সংকলিত গ্রন্থ রচনা করেছেন পরাগ আজিম। *১০০ বছর আগে ঢাকা প্রকাশ* এই শিরোনামে (২০০২-২০০৪) সাল পর্যন্ত দৈনিক প্রথম আলো'তে *ঢাকা প্রকাশের* সংবাদ অবিকৃতভাবে ছেপেছিল।[১৮] সেগুলো একত্রে পরাগ আজিম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ২০০৫ সালে প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা এই বইটি প্রকাশ করে। পত্রিকায় ছাপানো সেই খবরগুলো তিনি সংগ্রহ করে বই আকারে প্রকাশ করেন। কিছু সংবাদে তিনি নিজের মতো করে শিরোনাম ও যোগ করেন।

মূলত নারী ও পত্রিকা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হলেও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুবই কম এবং আমার জানামতে আমার আলোচ্য বিষয় *ঢাকা প্রকাশে* প্রতিফলিত ঢাকার নারীর জীবনের ইতিহাস নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। ইতিহাসের এই

---

[১৫] মুনতাসির মামুন, *ঢাকা প্রকাশ ও পূর্ব বাংলার সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৭।

[১৬] আরিফা সুলতানা, *ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় নারী বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও সংকলন*, এটি ইউজিসি থেকে প্রকাশিত ২০১৩ সালের একটি প্রকল্প।

[১৭] আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা, ২০২৩।

[১৮] পরাগ আজিম, *১০০ বছর আগে ঢাকা প্রকাশ* (২০০২-২০০৪) খ্রি., প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

অসম্পূর্ণতা দূর করার উদ্দেশ্যে (১৮৬৩-১৯৫৯) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার তৎকালীন নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস রচনা করার প্রয়াস আমি পেয়েছি।

আশা করা যায় পরবর্তীতে গবেষকগণ এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত গবেষণায় উৎসাহিত হবেন। তাছাড়া এই কাজ দেখে গবেষকরা যদি *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার কোনো বিষয় সবার সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নেন তাহলেও আমি নিজেকে সার্থক মনে করব। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যত সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোতে মুসলিম নারীসমাজের করুণ চিত্র প্রতিফলন করা হয়েছিল এবং এর মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলাই ছিল মূল লক্ষ্য।

ঢাকা ও ঢাকা প্রকাশ

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত মুঘল রাজধানী ঢাকা ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রথমদিকে পরিণত হয়েছিল একটি জেলা শহরে। খ্রিস্টীয় সাত শতকের পূর্বে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রাথমিক কালের ইতিহাস অস্পষ্ট হওয়ায় এই নগরীর পত্তন কবে এবং কিভাবে ঘটে তা নিদিষ্ট করে বলা সম্ভব হয় না। গুপ্ত, পাল, বর্মন, সেন শাসনামলে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা হিসেবে সাভার, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। (১৩৩৮-১৫৩৮) খ্রি. রাজধানী সোনারগাঁও এর নিকটে হিসেবে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ নগরী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ইসলাম খান এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। এ সময় থেকেই রাজধানী ঢাকার যাত্রা হয় এবং একশত বছর ঢাকা রাজধানীর মর্যাদায় আসীন থাকে ।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধপরবর্তী সময়ে কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে ঢাকার মূল্যায়ন কমতে থাকে। তবে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে এটি বাংলার একটি অন্যতম উদীয়মান শহর হিসেবে গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করে। ১৯০৫ সালে শহরটি পূর্ব বাংলা ও আসাম রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং রাজধানী ঢাকা ১৯১১ সালে তার পূর্বের মর্যাদা হারালেও নগরায়ণের উপাদানগুলো ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করতে থাকে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সংবাদপত্র। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর এটি আবার রাজধানীতে পরিণত হয়। ঢাকা থেকে এই সময় কালের নারী জীবনের বহু বিচিত্র চিত্র পাওয়া যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার পূর্বে ঢাকা নগরী তিনবার রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। অবশ্য এই তিনবারই ঢাকা হয়েছিল প্রাদেশিক রাজধানী। দীর্ঘদিন রাজধানী থাকার ফলে সংগত কারণেই ঢাকা নগরী রাজনৈতিকভাবে যেমন গুরুত্ব অর্জন করে, ঠিক তেমনি অর্থনীতি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঘটে উন্নয়ন। শিক্ষাও এই উন্নয়নের ক্ষেত্র থেকে আলাদা ছিল না। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষাব্যবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

মতো ঢাকা নগরীর শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে বাংলা সমাজ বিবর্তনের ধারায় ঢাকার শিক্ষাব্যবস্থারও অগ্রগতি হয়।

১৯ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঢাকা শহরে কতিপয় কলেজ ও ইংরেজি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এ সময়ে ঢাকার শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ১৯ শতকের ৪০'র দশক থেকে ঢাকায় একটি আধুনিক মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ঘটতে থাকে। এর পূর্বে (১৭৬৫ – ১৮-৩৯) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭৬ বছর কোম্পানি সরকার ঢাকা শহর উন্নতিকল্পে কোনো নীতি বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি।

এ সময় কাল থেকে ঢাকাকে বস্তুত পূর্ব বাংলার রাজধানীরূপে গণ্য করা হয়। বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢাকা তথা বাংলাদেশে চালু আছে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হওয়ার পর। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা, কারিগরি প্রকৌশল প্রভৃতি শিক্ষার যে ধারা এখন বিকশিত তার উৎসকাল ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শাসনের সময়েই। এক্ষেত্রে ঢাকায় যে সকল আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিকাশ লাভ করে তা পূর্ব বাংলার জনজীবনে বিশেষ অবদান রাখে। ১৮৩৫ সালে ঢাকা শহরের আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে সরকার কর্তৃক লোকাল এডুকেশন কমিটি গঠন করা হয়। উনিশ শতকের ৮০'র দশকে ঢাকা শহর কলকাতার পরেই বাংলা প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই আধুনিক শিক্ষা প্রশাসনের ফলে ঢাকায় একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্য থেকেই আধুনিক সংবাদপত্র ও সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার উদ্ভব ঘটে। আধুনিক শিক্ষা অধিগ্রহণ করেছিল হিন্দু সম্প্রদায়। ১৮৪১ সালে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতির পরিবর্তনের ঢেউ ঢাকার জীবনেও প্রভাবিত হয়।[১৯]

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফলে এ অঞ্চলের প্রশাসন পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে এবং ঢাকার গুরুত্ব কমে যায়। এ সময় ইংরেজরা তাদের প্রতিষ্ঠিত নগর কলকাতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে একেই রাজধানীতে পরিণত করে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবাবদের রাজধানী মুর্শিদাবাদ গুরুত্ব পাচ্ছিল। ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকে ঢাকায় তাদের নির্মিত ভবন ছিল নিমতলী কুঠি (১৭৬৬), এটি ছিল নায়েব নাজিমদের বাসভবন। এতে অ্যাংলো মোগল ঘরানার স্থাপত্য শৈলী দেখা যায়।[২০]

---

[১৯] মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, *উনিশ শতকে ঢাকার আর্থ সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা: একটি পর্যালোচনা*, সোমবার, ১৭ জানুয়ারি, ২০২২।

[২০] এমরান জাহান, *আধুনিক ঢাকার উদ্ভব ও সংবাদপত্রের গোড়ার কথা*, ৬ মে, ২০১৪ (https://www.bahumatrik.com/the-media/news/359)

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণার বিষয় *ঢাকা প্রকাশ* ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। সে সময় ঢাকার শাসক কে ছিলেন সে সম্পর্কে একটু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হলো। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পরবর্তী প্রায় ১০০ বছর ধরে ঢাকার নবাব পরিবার ছিলেন পূর্ব বাংলার সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবার। ঢাকার নবাব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কাশ্মীর থেকে বাংলায় আসেন। খাজা আব্দুল গনি ছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার ও সম্মানিত ব্যক্তি। তার সময় ইংরেজদের সাথে ঢাকার নওয়াব পরিবারের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর আব্দুল গণি জমিদারির কার্য্যভার পুরোপুরি গ্রহণ করার তিন বছর পর ভারতে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব বিপন্ন হয়ে পড়লেও আব্দুল গণির সহায়তায় ইংরেজরা ঢাকার পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখতে সক্ষম হয়।

তারই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ সরকারের কাজকর্মে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে এবং তাকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে খাজা আব্দুল গণিকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে নওয়াব উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব আব্দুল লতিফ কর্তৃক মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ব্রিটিশদের সময় *ঢাকা প্রকাশ* রচিত হলেও ভারত পাকিস্তানের বিভক্তির পরেও তা গৌরবের সাথে টিকে ছিল। ১৯৪৭ সালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশগুলো নিয়ে গঠিত হয়ে পাকিস্তান। এই পূর্ব পাকিস্তান থেকেই আবার *ঢাকা প্রকাশ* প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১৯৫২ সালে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এখানে মেয়েরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার নারীরা ঘরের বাইরে বের হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে। সামরিক শাসন চলাকালীন একটি পত্রিকা তার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারে না। এ প্রেক্ষাপটে পত্রিকাটি ১৯৫৯ সালে প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

ঢাকা শহরের ইতিহাসে ১৮৬০ সালটি স্মরণীয় হয়ে আছে। এই সালে বাঙ্গলা যন্ত্র নামে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা ছিলেন ব্রজ সুন্দর মিত্র, ভগবান চন্দ্র (পুত্র জগদীশচন্দ্র বসু), কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মিত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।[২১] ১৮৬০ সালে তাদের নেতৃত্বে প্রথম বাংলা সাহিত্য সাময়িকি কবিতা কুসুমাবলি প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঢাকায় বাংলা সংবাদ সাময়িক পত্র প্রকাশের পথ সূচনা করে। এখান থেকেই ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের কালজয়ী নাটক নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়। সাময়িক পত্রের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির জীবনের অমূল্য সব

[২১] মুনতাসির মামুন, *ঢাকা প্রকাশ ও পূর্ব বাংলার সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৭, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উপকরণ। সে সময় তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিহাস অন্বেষণের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাময়িক পত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রায় ১৫০টি সাময়িক পত্রের ইতিহাস সংকলন করেছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তার গ্রন্থে। কিন্তু সেগুলো কলকাতা কেন্দ্রিক প্রকাশিত সাময়িক পত্র নিয়ে রচিত ছিল।

শুধুমাত্র ঢাকার সাময়িক পত্র নিয়ে কাজ হয়েছে খুবই কম। আর ঢাকার নারী এবং সংবাদপত্র নিয়ে কাজ তো নগণ্য। সে সময় ঢাকা থেকে প্রচুর সংখ্যক সাময়িক পত্র প্রচারিত হয়েছে। এত এত সাময়িকপত্রের ভিড়ে শুধুমাত্র *ঢাকা প্রকাশ* ছাড়া অন্যগুলো এখন নেই বললেই চলে। *ঢাকা প্রকাশের* অবস্থাও খুবই জীর্ণশীর্ণ হার্ডকপি এখন ধরার উপযোগী নেই। শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এর সফট কপি সংরক্ষিত রয়েছে ডিজিটালাইজড সংস্করণরূপে। সেগুলোই এখন এই পত্রিকা অন্বেষণের একমাত্র সহায়ক।

১৯ শতকের স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ফলে মহিলারা নিজেদের অধিকার, অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠেন। আর এ সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় সে সময় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে। তেমনি একটি পত্রিকা হচ্ছে *ঢাকা প্রকাশ*, যা বাংলাদেশের ঢাকা থেকে প্রকাশিত স্বনামধন্য একটি পত্রিকা যাতে নারী বিষয়ক অনেক বিষয় স্থান পেয়েছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত খুব বেশি পত্রপত্রিকার তথ্য না পাওয়া গেলেও যে কয়টি পত্রিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে *ঢাকা প্রকাশ* অন্যতম।

তবে এর পূর্বে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা হচ্ছে *দি ঢাকা নিউজ*। এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ঢাকা প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হতো। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থাপনা পরিবর্তিত হয় এবং ১৮৬৯ সালে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়, এর সম্পাদক ছিলেন আলেকজান্ডার ফর্বেস। পরে তিনি পত্রিকা ছেড়ে কলকাতার হরকড়া পত্রিকার সম্পাদক হন। *ঢাকা নিউজ* টিকে ছিল প্রায় ১৩ বছর। পত্রিকাটি বরাবর নীলকরদের সমর্থন করতো এবং তাদের স্বার্থরক্ষা করে চলতো।[২২]

ইংরেজি পত্রিকা হলেও *ঢাকা নিউজ*'কেই ঢাকার প্রথম পত্রিকা হিসেবে স্বীকার করতেই হবে। পরবর্তীতে ব্রজসুন্দর মিত্র, ভগবান চন্দ্র বসু, কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৮৬০ সালে ঢাকার বাবু বাজারে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকাবাসীর জন্য তা বিপ্লবের জন্ম দেয়। এখান

[২২] মুনতাসির মামুন, *ঢাকা সমগ্র* ২, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা - ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই ১৮৬১ সালে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার জন্ম হয়। এই পত্রিকা তখন তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। *ঢাকা প্রকাশ* বাংলাদেশের ঢাকায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র যা বাংলা তারিখ ২৫ ফাল্গুন ১২৬৭ (৭ মার্চ ১৮৬১) প্রথম প্রকাশিত হয়। পাঠক জনপ্রিয়তার কারণে প্রায় ১০০ বছর ধরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

ঢাকার সংবাদ সাময়িক পত্রকে ঘিরে একদল সাংবাদিক ও লেখকের সৃষ্টি হয় এবং এ সব কিছুর কৃতিত্ব বাঙ্গালা যন্ত্রকে দিতে হয়। ঢাকার সাহিত্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন যে সকল ব্যক্তি তারা হলেন: কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, শ্রীনাথ চন্দ্র, হরচন্দ্র চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র বসু প্রমুখ। সুতরাং ঢাকায় সংবাদ সাময়িক পত্রের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা এক গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণের ভূমিকা পালন করে।

ঢাকা প্রকাশের প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। তার পরে দীননাথ এর পরিচালনায় পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পরে সে ভার অর্পিত হয় জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ও গোবিন্দ প্রসাদ রায়ের উপর। *ঢাকা প্রকাশ* প্রথমে ব্রাহ্মদের পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, বিভিন্ন সময় মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং রাজনৈতিক বিষয়ে এটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে সবসময়।

ঊনবিংশ শতকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত কিছু পত্রিকা হচ্ছে: *ঢাকা নিউজ (১৮ এপ্রিল, ১৮৫৬), কবিতা কুসুমাবলি, সাহিত্য (মাসিক) ১৮৬০, মনোরঞ্জিকা (মাসিক, ১৮৬০), ঢাকা প্রকাশ (সাপ্তাহিক, ৭ মার্চ ১৮৬১), চিত্ত রঞ্জিকা (মাসিক, ১৮৬২), ঢাকা বার্তা প্রকাশিকা (সাপ্তাহিক, জুন, ১৮৬২), অবকাশ রঞ্জিকা (মাসিক সেপ্টেম্বর, ১৮৬২), ঢাকা দর্পণ (সাপ্তাহিক জুলাই, ১৮৬৩), কাব্য প্রকাশ (মাসিক ১৮৬৪), হিন্দু হিতৈষিনী (সাপ্তাহিক, মার্চ, ১৮৬৫), বেঙ্গল টাইমস (সপ্তাহে দুই দিন, ১৮৬৯), মিত্র প্রকাশ (মাসিক, ১৮৭০), বঙ্গবন্ধু (১৮৭০), শুভ সাধিনী (সাপ্তাহিক, ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১), হিতকরী (সাপ্তাহিক, ১৮৭১), মহাপাপ বাল্যবিবাহ (মাসিক, ১৮৭৩), বান্ধব (মাসিক, ১৮৭৪) আষাঢ়, ১২৮১, ঢাকা গেজেট (সাপ্তাহিক, ১৮৮৬), গরিব (সাপ্তাহিক, ১৮৮৬)* প্রভৃতি।[২৩]

মূলত পার্শ্ববর্তী দেশ কলকাতায় বহু পূর্বে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও ঢাকায় সে সময় বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। কলকাতায় সংবাদপত্র প্রকাশের ছিয়াত্তর বছর পরে ঢাকায় ইংরেজি পত্রিকা *দি ঢাকা নিউজ* প্রকাশিত হয় কিন্তু এর কিছুকাল পরেই বাংলা সংবাদপত্রের

[২৩] এমরান জাহান, *আধুনিক ঢাকার উদ্ভব ও সংবাদপত্রের গোড়ার কথা*, ৬ মে, ২০১৪ (https://www.bahumatrik.com/the-media/news/359)

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। সেই প্রয়োজন থেকে ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার জন্ম হয়, যা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। যার উদ্ভব ঢাকা তথা পূর্ব বাংলার ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আনয়ন করে।[২৪]

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংবাদ ছাপানো হতো। শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা, হিন্দু সমাজ, সম্রাটের বিভিন্ন সংবাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নারী প্রসঙ্গ, তথা নারী কারাগার, প্রেমের পরিণাম, কংগ্রেস কর্মীদের খবর, বঙ্গের সংক্রামক রোগ, চুরি, ডাকাতি, বালিকা বিদ্যালয়, ম্যালেরিয়া, জল সম্পর্কে আলোচনা, নির্বাচন, রাজনীতি, হত্যা, আত্মহত্যা, নির্যাতনের মাধ্যমে নারী হত্যা, পরীক্ষার ফল প্রকাশের খবর, নারীদের বৃত্তির খবর, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে প্রায় ১০০ বছর ধরে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

গবেষণার সময় কাল

বর্তমান গবেষণার সময় কাল ধরা হয়েছে ১৮৬৩ থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। *ঢাকা প্রকাশ* যদিও আত্মপ্রকাশ করে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ। কিন্তু প্রাচীন পত্রিকা হওয়ার কারণে ১৮৬৩ সালের পূর্বের কোনো পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়নি। *ঢাকা প্রকাশ* তার পাঠক জনপ্রিয়তার কারণে পরবর্তী প্রায় ১০০ বছর ধরে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে এবং গ্রন্থাগারে এর সর্বশেষ সংখ্যার তারিখ আমার জানা মতে ১২/০৪/১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ। এ কারণে আমার গবেষণার সময় কালও (১৮৬৩-১৯৫৯) খ্রিস্টাব্দ ধরা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আমার প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটি বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ হবে। এই গবেষণাটি মূলত পত্রিকানির্ভর হওয়ায় এক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্পে মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার ডিজিটাল সংস্করণ (১৮৬৩ – ১৯৫৯) খ্রিস্টাব্দ দৃষ্ট হবে। এই গবেষণায় দ্বিতীয় উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই লক্ষ্যে *ঢাকা প্রকাশ* ছাড়াও আরো অন্যান্য সাময়িক পত্র, বই পুস্তক, প্রবন্ধ, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন, ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হবে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রাথমিক উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এক্ষেত্রে জরিপ এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। একটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সংবাদ ও সাময়িক পত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সে সময়কার (আলোচ্য সময়) প্রকাশিত বাংলার সাময়িক পত্রগুলোতে অল্প পরিসরে সমসাময়িক নারীসমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। নারী

[২৪] মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র*, চতুর্থ খণ্ড, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা - ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২।

সমাজের অবস্থার চিত্র প্রতিফলনও সেই অধঃপতিত অবস্থার উন্নয়ন সাধন সম্পর্কে মতবাদ প্রকাশ করে জনমত গড়ে তোলাই ছিল তৎকালীন সাময়িক পত্রপত্রিকার অন্যতম মূল লক্ষ্য। এমন একটি জনপ্রিয় পত্রিকা হচ্ছে *ঢাকা প্রকাশ*। আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা যে সকল খবর পরিবেশন করেছে তার মধ্যে ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবন কেমন ছিল? সে সময়ে ঢাকার নারীদের জীবনযাত্রায় সংস্কৃতি কিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে, তাদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হতো, তারা ঘরে বাইরে কিভাবে মূল্যায়িত হতো, সমাজে তাদের মূল্যায়নটা কেমন ছিল, নারীনির্যাতনের ধরন কেমন ছিল, নারী শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল, রাজনীতিতে তাদের পদচারণা ছিল কি-না, সাহিত্যে তাদের অবদান কি, বিভিন্ন আন্দোলনে নারীরা কোনো ভূমিকা পালন করেছিল কি-না, নাকি নিষ্ক্রিয় ছিল, তারা কি শুধুমাত্র ঘরের কাজই করতো নাকি বাইরের জগতেও তাদের পদচারণা ছিল, অর্থনৈতিকভাবে তারা স্বাবলম্বী হতে পেরেছিল কি-না, এবং দেশ বিভাগের ফলে কি ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তাদের জীবনে প্রবেশ করেছিল আর সেগুলো *ঢাকা প্রকাশ* কিভাবে তুলে ধরেছিল সেগুলোই আমি সবার সামনে উন্মোচন করার সামান্য প্রয়াস চালিয়েছি।

উদ্দেশ্য

১. *ঢাকা প্রকাশ* (গবেষণার সময় কাল ১৮৬৩ থেকে ১৯৫৯) সাময়িকপত্রে নারীর সাংস্কৃতিক জীবনকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

২. শিক্ষার আলো কিভাবে নারীদের সংস্কৃতি চর্চায় ভূমিকা রেখেছে তা তুলে ধরা।

৩. আলোচিত সময়ে নারীর সামগ্রিক জীবন উন্নয়নে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তা ঢাকার নারীদের সাংস্কৃতিক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন আনয়ন করেছে তা খুঁজে বের করা।

৪. ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত পাকিস্তানের জন্ম হলে ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে পরিণত হয় এবং এই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার আলোকে তা উপস্থাপন করা।

গুরুত্ব/যৌক্তিকতা

ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১) বাংলাদেশের ঢাকা শহরের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। গবেষণার বিষয় হিসেবে *ঢাকা প্রকাশ* সাময়িক পত্রের আলোকে ঢাকার তৎকালীন নারীর সাংস্কৃতিক জীবন (১৮৬৩-১৯৫৯) নির্বাচনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে সেই সময় ঢাকার মেয়েরা কেমন ছিল, তাদের জীবনযাপন, পোশাক, সৌন্দর্য চর্চা মোট কথা তাদের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে জানাতে পারব। ফলে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীদের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাটিও

সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। গবেষণার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হব তা দেশের অন্যান্য সাময়িক পত্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে। ঢাকার নারীদের সাংস্কৃতিক জীবন জানার জন্য *ঢাকা প্রকাশ* একটি অন্যতম উপাদান। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন ও গবেষণা। ইংরেজদের আগমনের পরে ঢাকার নারীদের সাংস্কৃতিক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তা এই পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরেছিল।

এ অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা :

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার পরিচিতি ও নারী প্রসঙ্গ।

তৃতীয় অধ্যায় : তৎকালীন নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়।

চতুর্থ অধ্যায় : নারী বিষয়ক খবরের ধরন, বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র্য।

পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমার এই গবেষণাকার্যে আমি উপরোক্ত অধ্যায়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করছি এটি নারী বিষয়ক অধ্যয়নের জন্য একটি তথ্যবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঢাকা প্রকাশের পরিচয় ও নারী প্রসঙ্গ

ঢাকা প্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অন্যতম একটি পত্রিকা। ঢাকা শহরের প্রথম সংবাদপত্র ছিল এটি। গ্রাহক সংখ্যার জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এটি ছিল সবার শীর্ষে। অত্যন্ত প্রভাবশালী পত্রিকা হওয়ার কারণে সরকার সবসময় এর মতামতকে গুরুত্ব দিত। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার মতো কোনো পত্রিকা এত দীর্ঘকালব্যাপী আর প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। ১০০ বছর টিকে থাকা এ পত্রিকাটি অনেক জনপ্রিয় ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুরুতে এই পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল ২৫০ এবং হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আন্দোলনের পরে এর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৫০০০।[১] *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা সরকারের কাছেও অনেক গুরুত্ব বহন করতো। *রিপোর্ট অন নেটিভ পেপার্স* উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে যতগুলো পত্রপত্রিকা ছিল তার মধ্য থেকে *ঢাকা প্রকাশের* সংবাদ বা মতামতগুলোই সংকলিত করতো।[২]

বাঙ্গালা যন্ত্র ও ঢাকা প্রকাশ

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয়। তবে ১৮৬৩ সাল থেকে পত্রিকাটি পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে এই পত্রিকার ডিজিটাল সংস্করণ, যা ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রয়েছে। পত্রিকাটির সর্বশেষ সংখ্যাটির তারিখ ১২-০৪-১৯৫৯। শেষ সময়ে সম্পাদক ছিলেন আব্দুর রশিদ খান। মুসলমানদের হাতে থাকা অবস্থায় পত্রিকাটির পরিসমাপ্তি হয়। প্রকাশিত হতো ইসলামপুরের কিতাব মঞ্জিলের ৫৯/৩ থেকে। পত্রিকাটি শেষ হওয়ার কিছুকাল আগে থেকেই শুধুমাত্র নিলামের ইশতেহারই প্রকাশিত হতো। তখন অন্য কোনো সংবাদ প্রকাশিত হতো না। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, শেষ পর্যন্ত *ঢাকা প্রকাশ* তার সেই পূর্বের জনপ্রিয়তা এবং গৌরব আর ধরে রাখতে পারেনি। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে টিকতে না পেরে পত্রিকাটি পরিণত হয় শুধুমাত্র নিলামের ইশতেহারে, যার ফলশ্রুতিতে এক সময় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটির বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ছিল ৫ টাকা, কিন্তু যাদের সামর্থ্য ছিল না, তারা পেত ৩ টাকায়, তাও তাদের গ্রাহক সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছিল।[৩]

---

[১] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা - ২০১৮, পৃ. ১৯।

[২] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র-২*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ২৪।

[৩] *Report on Native Papers, 1879* সূত্র : (উনিশ শতকে বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র, মুনতাসীর মামুন)

[৪]

ছবি : *ঢাকা প্রকাশ*

বাঙ্গালা যন্ত্র এবং *ঢাকা প্রকাশ* ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঢাকার প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র হচ্ছে বাঙ্গালা যন্ত্র। পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িকপত্র *মনোরঞ্জিকা* এই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। **নীলদর্পণ** নাটকও এই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। মূলত এই মুদ্রণ যন্ত্রটি ঢাকার ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। বাঙ্গালা যন্ত্র শুধু *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকাই নয়, অন্যান্য আরও বইপত্রও মুদ্রণ করেছিল। বাঙ্গালা যন্ত্রের সফলতা দেখে আরো অনেকেই মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং আরও নতুন নতুন পত্রপত্রিকার প্রকাশ করতে থাকেন। তাই বলা যায় সে সকল পত্রিকা প্রকাশের পেছনে *ঢাকা প্রকাশের* সফলতা অনেকভাবেই প্রভাবিত করেছিল। বাঙ্গালা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য পাই, কারা এ যন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিল সে বিষয়ে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাঢ়িখাল গ্রামবাসী বিজ্ঞানাচার্য স্যার জগদীশচন্দ্রের পিতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বসু, মালখানগরবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু রামকুমার বসু, ঢাকা জেলার সদর জিলার সদর উপরিভাগের অন্তর্গত তেঁতুলঝোড়া গ্রামবাসী স্বনামখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ধামরাই গ্রামবাসী বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর ও পরবর্তী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক প্রমুখ এর উদ্যোগ ও যত্নের ফলেই বিগত ১২৬৬ বঙ্গাব্দে (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে) তৎকালে প্রচলিত একটি মুদ্রণ যন্ত্র (চিলাপ্রেস) ও অক্ষরাদি আনীত হইয়া 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে ঢাকা নগরীর বাবু বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মধর্মের মতামত প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এই যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কারণ তারা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায়

[৪] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/FirstPageDhakaProkash.JPG/220px-FirstPageDhakaProkash.JPG

যৌথ মালিকানার এই প্রেস থেকে পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িক পত্র মাসিক *মনোরঞ্জিকা* প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু এই সাময়িক পত্রটি পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকগণ নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে মতভেদজনিত কারণে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। তখন তারা আরেকটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে বদ্ধপরিকর হন এবং তারই ফলস্বরূপ ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ২৪ ফাল্গুন বৃহস্পতিবারে নতুন একটি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ হয় যার নাম কালজয়ী *ঢাকা প্রকাশ*। ধারণা করা হয় ব্রাহ্ম ধর্মমত প্রকাশের জন্য উৎসাহিত হয়ে পরিচালকবৃন্দ *ঢাকা প্রকাশ* প্রকাশনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ঢাকা প্রকাশের নামকরণ এবং সম্পাদকমণ্ডলী

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার নামকরণ করতে যেয়ে হয়তোবা পরিচালকরা কলকাতার *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার সম্পাদক বা মালিকানা বহুবার বদল হলেও এর প্রকাশ ছিল অব্যাহত এবং কালক্রমে এই পত্রিকা রূপান্তরিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান পত্রিকা হিসেবে। তৎকালীন সময়ের বেশিরভাগ পত্রপত্রিকাসমূহে সম্পাদকের নাম উল্লেখ না থাকায় প্রায় ক্ষেত্রেই কখন কে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তা বের করা দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা অনুসন্ধান করেও একই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়েছে, তবে *ঢাকা প্রকাশের* সম্পাদকের নাম সম্পর্কে তথ্য পেতে পূর্ণচন্দ্রের প্রবন্ধ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। নিচে সম্পাদকদের সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো :

[৫]

ছবি : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

[৫] https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQ6U5DNxSKoQMPexXZJhEjsFXm4zJBZ2OEC3yZUwMrd9t4nbQ2GZx_E8Jm0_gq6FjY8-wFDEUURq0HOtQFj4t3l5iIysW99ZxsdJvbQ

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। তার নাম পাওয়া যায় পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত, তবে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। তিনি বলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের উপর সম্পাদকের দায়িত্ব ছিল না। তার নাম চতুর্থ বৎসরের ২২ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশকরূপেই পাওয়া যায়। মূল সম্পাদক *ঢাকা প্রকাশের* দ্বিতীয় বর্ষের শেষ দিকে কর্মচ্যুত হয়েছিলেন। এই খবরের সঠিকতা প্রমাণ করার জন্য তিনি *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। আবার কোনো সময় দেখা গিয়েছে পত্রিকার হেড কম্পোজিটর কর্তৃক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তবে অন্যান্য সূত্র অনুসন্ধান করে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারই প্রথম ৪ বছর পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এ বিষয়ে মোটামুটি ধারণা করা যায়।

[৬]

ছবি : দীননাথ সেন

দীননাথ সেন

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পরে *ঢাকা প্রকাশ*-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন দীননাথ সেন। তিনি ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় যোগদান করেন। তিনি একজন স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন। ঢাকা তথা পূর্ব বাংলার পত্রিকা জগতের প্রথম সাংবাদিক ছিলেন তিনি। তিনি পরিচিত ছিলেন বাঙালি সমাজসংস্কারক হিসেবে। তিনি ঢাকা শহরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। মানিকগঞ্জ জেলার দাশরা গ্রামে ১৮৩৯/১৮৪০ সালে সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে কুমিল্লা জেলা স্কুলে এবং পরবর্তী জীবনে শিক্ষা গ্রহণ করেন ঢাকা কলেজ থেকে। তিনি ঢাকার পোগোজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন (১৮৬১-১৮৬৪) সাল পর্যন্ত। তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলেও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন তিনি। এরপর নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি আরও দায়িত্ব পালন করেছিলেন পূর্ব বাংলার স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর হিসেবে।

[৬] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Dinanath_Sen.jpg/220px-Dinanath_Sen.jpg

তৎকালীন সময়ে (১৮৫৮ খ্রি.) ঢাকাতে বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন ব্রাহ্ম স্কুল) প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি তখন নারীদের জন্যও অনুরূপ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে ইডেন স্কুল প্রতিষ্ঠায় নিজেকে স্মরণীয় করে রাখলেন। তার নামানুসারে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় একটি সড়কের নাম হয়েছে দীননাথ সেন রোড। ঢাকা শহরের একজন প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ হিসেবে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার সম্পাদনা গ্রহণ করার পরে পত্রিকাটি বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে শুক্রবারে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং এরপর রবিবারে প্রকাশিত হতে শুরু করে পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ থেকে। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তিনি যৌবনকাল থেকেই অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপনে। তবে তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন প্রাপ্ত বয়সে। ধারণা করা হয় তিনি সবচেয়ে কম সময় *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী

এরপরে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী। তবে তার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না।

গোবিন্দ প্রসাদ রায়

তারপরে পত্রিকার সম্পাদক হন গোবিন্দ প্রসাদ রায়। তিনিও ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী ছিলেন। পত্রিকার মালিকানা তিনি কিনে নিয়েছিলেন। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন গোবিন্দ প্রসাদ রায়। যখন পত্রিকাটি পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করে তখন তিনি এর স্বত্ব এবং বাঙ্গালা যন্ত্র দুটোই কিনে নিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের একমাত্র পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানে, যা রানি ভিক্টোরিয়ার **'ভারতেশ্বরী'** উপাধি লাভ করা উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল।

অনাথ বন্ধু মৌলিক

গোবিন্দ প্রসাদ রায়ের পর পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে থাকেন অনাথ বন্ধু মৌলিক। অল্প কিছুদিন পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করার পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে পত্রিকার হাত বদল করে সম্পাদনার দায়িত্ব পড়েছিল ঢাকা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনাথ বন্ধু মৌলিকের উপর। গোবিন্দ প্রসাদ সুস্থ হয়ে পত্রিকার সম্পাদনার কাজে ফেরার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুই বছর অনাথ বন্ধু মৌলিক পত্রিকাটির দায়িত্ব পালন করেন।

পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ চন্দ্রনাথ ও যাদবচন্দ্র সেন

ঢাকা প্রকাশে গোবিন্দ প্রসাদের সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ চন্দ্রনাথ। গোবিন্দ প্রসাদ মৃত্যুবরণ করেন ১২৮৯ বঙ্গাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পরে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা এবং বাঙ্গালা যন্ত্রের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তার জামাতা যাদবচন্দ্র সেনের উপর। দুই বছরের বেশি তিনি পত্রিকা চালাতে পারেননি। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তিনি ১২৯১ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটির স্বত্ব এবং বাঙ্গালা যন্ত্র ৩ হাজার ৪৫০ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন মানিকগঞ্জের চারিপাড়া গ্রামবাসী তালুকদার বাবু গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরীর নিকটে।

দীনেশ চরণ বসু

গুরুগঙ্গা আইচ ১২৯২ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেন দীনেশ চরণ বসুকে ৫০ টাকা বেতনের বিনিময়ে। তিনি পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা একজন কবি ছিলেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণিয়াতে দীনেশ চরণের জন্ম। তার পৈতৃক বাড়ি মানিকগঞ্জের শ্রী বাড়িতে। পড়ালেখায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে কলকাতা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু বিভিন্ন শারীরিক জটিলতার কারণে মেডিকেলে তার পড়ালেখা হয়নি। তিনি পূর্ববঙ্গে এসে ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ মাইনর স্কুলে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দীনেশ চরণ বসু মাত্র ২ মাস পত্রিকার দায়িত্বে থাকার পর পদত্যাগ করেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে।

গুরুগঙ্গা আইচ

দীনেশ চরণ বসু মাত্র দুই মাস দায়িত্বে থাকার পর গুরুগঙ্গা আইচ নিজেই পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় থেকে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন সূচিত হয়। কারণ গুরুগঙ্গা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের। তিনি প্রায় ১৬ বছর (চৈত্র ১২৯১ বঙ্গাব্দ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তার সময় কালের শেষের দিকে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল তৎকালীন সময়ের প্রভাবশালী তিনজন ব্যক্তির দ্বারা। গুরুগঙ্গা প্রথম মামলাটি মেটাতে পারলেও শেষেরটা মেটাতে পারেনি এবং সে মামলায় তার জেল হয়েছিল এক মাস। বাধ্য হয়ে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে তিনি পত্রিকার স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী (বি.এ) এবং বাবু রাধারমন ঘোষ (বি.এ)

শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী (বি.এ) এবং বাবু রাধা রমন ঘোষ (বি.এ) *ঢাকা প্রকাশের* স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন। তাদের সময়ও *ঢাকা প্রকাশে* হিন্দুদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কারণ তারা পূর্বের মত অনুসরণ করেই পত্রিকা পরিচালনা করতেন। মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী পত্রিকাটি কেনার পরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার নিজের হাতেই গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় পত্রিকার আকার পরিবর্তিত হয়ে ডাবল ক্রাউন হয়েছিল। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে মুকুন্দ বিহারী পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার সহকারী হিসেবে যারা কাজ করেছিলেন তারা হলেন– পণ্ডিত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্তী, নিশিকান্ত ঘোষ, গিরিজাকান্ত ঘোষ, উমেশচন্দ্র বসু, হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়, মধুসূদন চৌধুরী এবং পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।[৭]

ব্রাহ্মদের সময়ে ঢাকা প্রকাশ

পত্রিকা চালানোর জন্য একক মালিকানা দেখা যায় না সেসময়। সবসময় যৌথ উদ্যোগেই পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এমনকি প্রেসও যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত হতো, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বাঙ্গালা যন্ত্র এবং *ঢাকা প্রকাশ* এর জন্ম হয়। শুরুর দিকে পত্রিকাটির সম্পাদকের চেয়ে কম্পোজিটরের বেতন ছিল বেশি। ১৮৬৩ সালে কম্পোজিটর পেতেন ৩০ টাকা আর কৃষ্ণচন্দ্র পেতেন ২৫ টাকা।[৮] *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, পত্রিকাটির মালিকানা হাত বদলের সাথে সাথে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। পত্রিকার নিজস্ব নীতি বলতে কিছু নেই। মূলত জনগণের মত প্রকাশ করাই পত্রিকার কাজ। তবুও সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের জন্য পত্রিকায়ও এর প্রভাব বেশ ভালোভাবেই পড়ত বলে মনে হয়েছে। যখনই যে পন্থিরা ক্ষমতায় এসেছে তারাই বিদ্যমান সমাজ সম্পর্কে আক্ষেপ করেছে। যখন ব্রাহ্মদের অধীনে ছিল পত্রিকা তখন তারা বলতো যে প্রাচীন পন্থিদের কারণে সমাজে অগ্রগতি হচ্ছে না, আর যখন রক্ষণশীল হিন্দুদের হাতে পত্রিকা গিয়েছে তখন তারা বলেছে যে ব্রাহ্ম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতের কারণে সমাজ অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে উভয়পক্ষই যে সমাজ নিয়ে চিন্তা করতো তা বোঝা যায় এবং তারা আহ্বান করেছে সকলকেই সমাজ নিয়ে চিন্তা করার জন্য।[৯]

বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা দলকে সমর্থন করতো তখনকার সংবাদ সাময়িক পত্রগুলো। *ঢাকা প্রকাশ* সংবাদপত্রেও তখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশেষ কোনো আদর্শের প্রতিফলন ঘটতো। যেমন-

---

[৭] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র-২*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি , ২০০৪, পৃ. ২৪-২৮।

[৮] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র*, পৃষ্ঠা. ১৫।

[৯] মামুন, *উনিশ শতকে বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র*, পৃষ্ঠা. ৪।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রথমে ব্রাহ্মদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করলেও পত্রিকাটি পরে গোঁড়া হিন্দুদের সমর্থন করতো এবং পত্রিকার শেষের দিকে মুসলমানদের সমর্থন করতে দেখা যায়। পত্রিকার খবরে মুসলমান নারীদের অনেক ইতিবাচক খবর, মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নামাজি মেডিকেল ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ঘোষণা, নারীদের নিয়ে আরও অনেক খবর যা ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত ইত্যাদি দেখা যায়। এ থেকে স্পষ্টভাবেই ধারণা লাভ করা যায় যে, পত্রিকার সম্পাদকরা তাদের নিজেদের ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাসের প্রতিফলন তাদের পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

রক্ষণশীল হিন্দুদের সময়ে ঢাকা প্রকাশ

১৮৮৪ সালের পর থেকেই *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা ব্রাহ্মদের অধীনতা থেকে রক্ষণশীল হিন্দুদের অধীনে চলে আসে। নারীচিত্রের সূচনা রক্ষণশীল হিন্দুদের সময় থেকেই সূত্রপাত হয়। ১৯০১ সালের পত্রিকায় **স্ত্রীরোগে অশোক** এর বিজ্ঞাপনে নারী চিত্র দেখা যায়। ১৯০৭ সালের পত্রিকায় **ময়ূর মার্কা প্রভাত কুসুম তৈল** এর বিজ্ঞাপনটি নারী চিত্র সহকারে দেখা যায় এবং **কেশরঞ্জন তেলের** বিজ্ঞাপনেও বেশিরভাগ সময়ই সচিত্র নারী চিত্র দেখা যায়।[১০]

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার মালিকানা হাতবদল হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ব্রাহ্মদের হাত থেকে হিন্দুদের হাতে আসার পরে তারা পূর্ববর্তী মত একদমই সমর্থন করে না। ব্রাহ্মরা যা বলে গেছেন হিন্দুরা একদমই তার উল্টো মত পোষণ করে। ব্রাহ্মদের অধীনে থাকার সময় পত্রিকা বিধবা নারীদের বিয়ের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ১৮৮৬ সালে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে দাবি করে। তারা এটাকে একেবারেই পাপ হিসেবে অভিহিত করেন। এ সময় পত্রিকার শেষে প্রকাশকের নাম উল্লেখ করা থাকতো। ১৮৯৩ সালের পত্রিকায় লেখা ছিল এই সাপ্তাহিক পত্র প্রতি রবিবার ঢাকার রাজার দেউরি হইতে বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হয় এবং প্রিন্টার শ্রীশমহন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সালের প্রকাশকের নাম এটাই ছিল। ১৯০৭ সালে আমরা দেখি পত্রিকার শেষে লেখা ছিল : এই সাপ্তাহিক পত্র প্রতি রবিবার বাঙ্গালা বাজার হতে ২১২ নং বাড়ি হইতে প্রিন্টার শ্রী কামিনী কুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

১৯১৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশকের নাম এটাই ছিল। ১৯১৪ সালে লেখা ছিল : পত্রিকাটি প্রতি রবিবার বাঙ্গালা যন্ত্র ২৯২ নং বাড়ি হতে প্রিন্টার শ্রী শশীভূষণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সাল পর্যন্ত ৭ বছর শশীভূষা বিশ্বাস কর্তৃকই প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়। ১৯২১ সালের পত্রিকার গঠনে কিছু পরিবর্তন আসে। প্রথমে বিজ্ঞাপন এবং *ঢাকা প্রকাশের* দুই পাশে বক্স

[১০] *ঢাকা প্রকাশ (১৯০০-১৯০৬)* সাল পর্যন্ত পত্রিকাগুলো থেকে নেওয়া।

আকারে তথ্য ছিল। বামে পত্রিকা সংক্রান্ত তথ্য এবং ডানে সিদ্ধচূর্ণের বিজ্ঞাপন ছিল। প্রত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৪। এ সময় পত্রিকাটিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ট্যাবলেটের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়িয়ে যায় দেখেই ট্যাবলেট আবিষ্কার হয় এসময়ে।[১১]

১৯২২ সালের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়ও একটু পরিবর্তন আসে। প্রথম পৃষ্ঠার উপরে রেজিঃ নং লেখা, তার নিচে বড় করে *ঢাকা প্রকাশ*, তার নিচে 'সিদ্ধিঃ সাদ্ধে সমামুস্ত', "প্রসাদাদিহ ধূর্জ্জটে।" তার নিচে সম্পাদকের নাম লেখা শ্রী মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী, বি.এ (যা এর পূর্বে দেখা যায় না), আর দুই পাশের ডান পাশে *ঢাকা প্রকাশের* কার্যালয়-২৯২ নং বাংলা বাজার, ঢাকা এবং লেখা ছিল এই পত্রিকাটি প্রতি রবিবার, বাঙ্গালা যন্ত্র, বাংলাবাজার ২৯২ নং বাড়ি হইতে প্রিন্টার শ্রী শশীভূষণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় এবং তার নিচে সিদ্ধচূর্ণের বিজ্ঞাপন ছিল। সম্পাদক শ্রী মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী ১৯২২ সালে এ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন এবং একাধারে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে যান। নারীদের আর একটি চিকিৎসার বিজ্ঞাপন ১৯২৮ সালের পত্রিকায় দেখা যায়। **অশোক কার্ডিএল** স্ত্রীলোকদিগের ঋতু কষ্ট, বাধক-প্রদর, রক্তস্রাব ইত্যাদি জরায়ু সংক্রান্ত সকল প্রকার রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।[১২]

১৯৩২ সালে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার অবয়বে কিছুটা পরিবর্তন আসে। *ঢাকা প্রকাশের* নিচে রেজিঃ নং : তার নিচে সিদ্ধি সাদ্ধে সমামুস্ত, প্রসাদাদিহ ধুজ্জটে। নিচে ছিল সম্পাদকের নাম লেখা। *ঢাকা প্রকাশের* বামে ছিল বক্স আকারে সিদ্ধচূর্ণের বিজ্ঞাপন, ডানে ছিল বক্সের মাঝে ইংরেজিতে সিদ্ধঃচূর্ণের বিজ্ঞাপন। এ থেকে সিদ্ধচূর্ণের গুরুত্ব বোঝা যায়। দুই ভাষাতেই বিজ্ঞাপন ছিল। এ সময় পত্রিকা সংখ্যা ছিল ১০টি। এই সালে নারী চিত্র সংবলিত Boroline এর বিজ্ঞাপন দেখা যায়। ১৯৩৩ সালেও *ঢাকা প্রকাশের* গঠনগত কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে *ঢাকা প্রকাশ* লেখা ছিল। তার নিচে সম্পাদকের নাম লেখা। *ঢাকা প্রকাশের* ডান পাশে বক্সের মাঝে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার কত টাকা এ সংক্রান্ত তথ্য ছিল এবং বাম পাশে বক্সের মধ্যে লেখা ছিল। কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার প্রবর্তিত -

বঙ্গের প্রাচীনতম সংবাদপত্র ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত। বঙ্গীয় জাগরণ, সমাজের মুখপত্র, *ঢাকা প্রকাশ* -সর্বত্র বহুল প্রচারিত বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা এক আনা, পুরাতন সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র। ১৯৩৩ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৯৩৪, ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালেও পত্রিকাটি এমনভাবেই সজ্জিত ছিল। ১৯৩৭ সালের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় *ঢাকা প্রকাশের* বামে যোগ জীবন ঔষধালয়ের

[১১] *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ এপ্রিল, ১৯২১, ঢাকা, ২১ চৈত্র, রবিবার, ১৩২৭, ৬০ ভাগ, ৪৭শ সংখ্যা।
[১২] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ চৈত্র, রবিবার, ১৩৩৪, ১ এপ্রিল, ১৯২৮, ৬৭ভাগ, ৩৬শ সংখ্যা।

সুসংস্কৃত মকরধ্বজ এর বিজ্ঞাপন ও ডানে *ঢাকা প্রকাশের* নিয়মাবলি ও বিজ্ঞাপনের হার দেয়া ছিল। প্রথম পৃষ্ঠায় *ঢাকা প্রকাশের* উপরে বামে ইংরেজিতে DACCA PRAKASH এবং ডানে REGTD NO C757 লেখা ছিল।[১৩]

১৯৪১ সালের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আবার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার উপরে মাঝে বড় অক্ষরে *ঢাকা প্রকাশ* লেখা। তার উপরে বামে DACCA PRAKASH এবং ডানে REGTD NO C757 লেখা ছিল। *ঢাকা প্রকাশের* বাম পাশে বক্স করে তাতে যে লেখাগুলো ছিল, তা হলো :

ঢাকা প্রকাশ
সম্পাদক
শ্রী মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী, বি.এ প্রণীত
সকল প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত
সর্বদর্শনের সার - বেদান্তের চরম প্রস্থান
তত্ত্বানুসন্ধী ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অমৃতোপম গ্রন্থ গীতানুশীলন
ডবল ক্রাউন, ১৬ পৃষ্ঠার ২০ ফর্মায় (মোট ৩২০ পৃষ্ঠায়)
পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান - *ঢাকা প্রকাশ* অফিস, ঢাকা।

ঢাকা প্রকাশের ডান পাশে বক্স করে *ঢাকা প্রকাশের* নিয়মাবলি ছিল, তার নিচে ছিল সাময়িক বিজ্ঞাপনের হার। এটা ম্যানেজার, *ঢাকা প্রকাশ* বরাবর লেখা ছিল। আর *ঢাকা প্রকাশের* নিচে লেখা ছিল-বঙ্গের প্রাচীনতম সংবাদপত্র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ১২৬৭ বঙ্গাব্দে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। 'সিদ্ধিঃ সাদ্ধে সমামুস্ত'।

"প্রসাদাদিহ ধূর্জ্জটে", সম্পাদক-শ্রীমুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী, বি.এ। এ সময় পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬। পত্রিকার এই সংখ্যায় **সাধনা ঔষধালয়ের** বিজ্ঞাপন দেখা যায়।[১৪] এ সময় পত্রিকার বাম পাশে কততম বর্ষ সেটা লেখা এবং ডান পাশে সংখ্যা লেখা থাকতো। পূর্বে যা সবসময় এক পাশে বামে লেখা থাকতে দেখা যায়। ১৯৪৩ সালে এসে পত্রিকা হয়ে যায় চার পৃষ্ঠার। এ সময়ও সম্পাদক শ্রী মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী ছিল এবং ১৯৪৬ সালে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ২।[১৫]

১৯৪৮ সালে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার অবয়বে আবার পরিবর্তন দেখা যায়। এ সময় *ঢাকা প্রকাশের* বামে বক্সের মধ্যে সিদ্ধচূর্ণের বিজ্ঞাপন প্রথমে বাংলায় এবং নিচে আবার ইংরেজিতে ছিল। মাঝের

[১৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ চৈত্র, রবিবার, ১১ এপ্রিল, ১৯৩৭, ৭৬ বর্ষ, ৪৯শ সংখ্যা।
[১৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ চৈত্র, রবিবার, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, ৬ এপ্রিল, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ, ৮০ বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা।
[১৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, ১১ আগষ্ট, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ, ৮৬ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা।

অংশটা একই ছিল ডানে বক্সের মধ্যে *ঢাকা প্রকাশ* সংক্রান্ত নিয়মাবলি এবং নিচে সাময়িক বিজ্ঞাপনের হার দেয়া ছিল।[১৬] এ সময়ও পত্রিকার বামে কততম বর্ষ লেখা এবং ডানপাশে সংখ্যা লেখা ছিল। এ সময় পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মাত্র ২টি। ১৯৪৯ সালে পুনরায় পত্রিকার গঠনগত কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। মাঝখানের *ঢাকা প্রকাশ* লেখাটা একটা বক্সের মধ্যে ছিল এবং *ঢাকা প্রকাশ* লেখাটা কালো কালি দিয়ে ভরাট করা ছিল। নিচে লেখা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রাচীনতম সংবাদপত্র, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। বাম পাশে *ইছলামিকা* গ্রন্থের বিজ্ঞাপন এবং ডানে বক্সে লেখা ছিল ইংরেজিতে- Geanings in Golden Fields The Best Reacler of the Year for Matric and High Madrasah. Candidate of 1951. এ সময় পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬ টি।[১৭]

মুসলমান সম্পাদকের সময়ে ঢাকা প্রকাশ

১৯৫০ সালের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা আবার আগের চেয়ে অনেক সাদামাটা দেখা যায়। বড় করে *ঢাকা প্রকাশ* তার নিচে দাগ দিয়ে বামে বর্ষ ও সংখ্যা, বাংলা সন ও তারিখ, বারের নাম, বাংলা সন, ইংরেজি তারিখ, ইংরেজিতে বারের নাম ও ইংরেজি সন, একদম ডানে প্রতি সংখ্যা কত আনা তা দেয়া ছিল। এ সময় পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২। ১৯৫০ সালে প্রথম কোন কোন সংবাদের নিচে সংবাদদাতার নাম দেখা যায়। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার গঠনগত এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত অনেক পরিবর্তন দেখা যায় ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত। কারণ এ সময় পত্রিকাটি মুসলমানদের হাতে আসে। প্রথমে ব্রাহ্মদের অধীনে এবং পরবর্তীতে রক্ষণশীল হিন্দুদের অধীনে দীর্ঘ অনেক বছর ধরে পত্রিকা পরিচালিত হয়। ধর্মীয় হাত বদলের সাথে সাথে পত্রিকায় অনেক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। এই প্রথম কোনো মুসলমান সম্পাদক পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। দায়িত্ব গ্রহণ করেই পত্রিকার গঠনগত পরিবর্তন তিনি করলেন।

প্রথম পৃষ্ঠার অবয়বে অনেক পরিবর্তন আনলেন তিনি। লাল রঙের বর্ডার দেখা যায় প্রথম পৃষ্ঠায়। উপরে বড় হরফে *ঢাকা প্রকাশ* লেখা। তার নিচে লাল হরফে লেখা - KITAB MANZIlS NEXT GFT-
Introduction To
Islamic Philosophy
By
Syedur Rahman
"A Unique study of its kind embodying all. The essentials of the lofty teachings of Islamand of its contribution to the evolution of human thought.

[১৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ৭৮ বর্ষ, ২২ চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ, ৪৭ সংখ্যা।
[১৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ৮৮ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৪শে মাঘ, রবিবার, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

Specially fascinating for those who are Eager to have delightful peeps into the historical and philosophical role of Islam."

তার নিচে তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা শিরোনামে নিচে কিছু তথ্য ছিল। সবার নিচে প্রাপ্তিস্থান-রশিদিয়া লাইব্রেরি, ইসলামপুর, ঢাকা লেখা ছিল। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- আব্দুর রশিদ খান এবং প্রত্রিকার শেষে লেখা ছিল- "ভারতী মেশিন প্রেস, ২৮ নং প্যারিদাস রোড, ঢাকা হইতে প্রিন্টার এম এ খান কর্তৃক মুদ্রিত এবং কিতাব মঞ্জিল লিমিটেড হইতে প্রকাশিত।"[১৮] এ সময় পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮টি। আব্দুর রশিদ খান **১৯৫১** সাল থেকে **১৯৫৯** সাল পর্যন্ত মোট ৯ বছর সম্পাদক হিসেবে ছিলেন। পত্রিকার পরিসমাপ্তি ঘটে তার সময়ে। **১৯৫৩** সালে পত্রিকার পৃষ্ঠার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪টিতে।[১৯]

মুসলমান সম্পাদক সম্পাদনার দায়িত্বে আসার পরে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হয়েছিল তা এখন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব এবং এই সময়টা আরো একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তান **১৯৪৭** সালে ইতিমধ্যেই বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। আর ঢাকা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। পাকিস্তান ছিল মুসলিম রাষ্ট্র। এজন্য *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা যখন মুসলমানদের অধীনে আসে তখন নারীদের প্রতিও ইসলামিক মনোভাব অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় যা আগে কখনো দেখা যায়নি। যেমন– **১৯৫০** সালের **১৬** এপ্রিল সংখ্যায়, **নামাজি মেডিকেল ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ঘোষণা** শিরোনামে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।

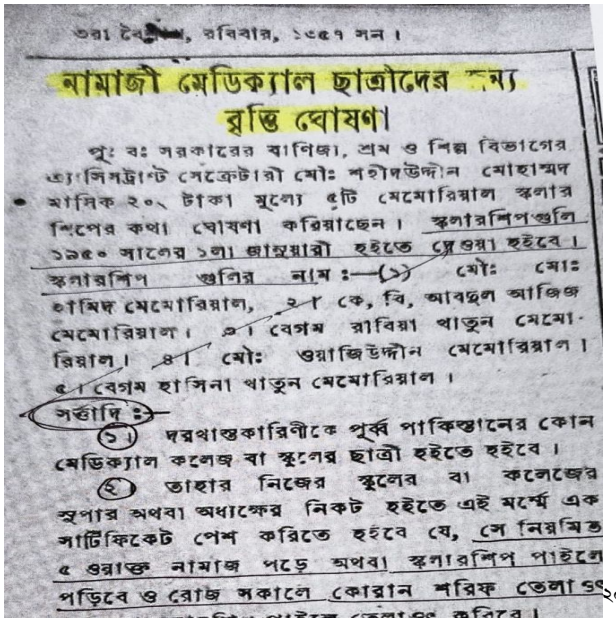

৩রা বৈশাখ, রবিবার, ১৩৫৭ সন।

নামাজী মেডিক্যাল ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ঘোষণা

পূঃ বঃ সরকারের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের এ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী মৌঃ শহীদউদ্দীন মোহাম্মদ মাসিক ২০৲ টাকা মূল্যে ৫টি মেমোরিয়াল স্কলারশিপের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। স্কলারশিপগুলি ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে দেওয়া হইবে।

স্কলারশিপ গুলির নাম :—(১) মৌঃ মোঃ হামিদ মেমোরিয়াল, ২। কে, বি, আবদুল আজিজ মেমোরিয়াল। ৩। বেগম রাবিয়া খাতুন মেমোরিয়াল। ৪। মৌঃ ওয়াজিউদ্দীন মেমোরিয়াল। ৫। বেগম হাসিনা খাতুন মেমোরিয়াল।

সর্ত্তাদি :

(১) দরখাস্তকারিনীকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের কোন মেডিক্যাল কলেজ বা স্কুলের ছাত্রী হইতে হইবে।

(২) তাহার নিজের স্কুলের বা কলেজের সুপার অথবা অধ্যক্ষের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে যে, সে নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে অথবা স্কলারশিপ পাইলে পড়িবে ও রোজ সকালে কোরান শরিফ তেলা[২০]

ঢাকা প্রকাশ (১৬ এপ্রিল, ১৯৫০)

[১৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ৮৮ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৪ মাঘ, রবিবার, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

[১৯] *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ এপ্রিল, ১৯৫৫, ২০ চৈত্র, ১৩৬১, ৯৪ বর্ষ, ৪৯শ সংখ্যা।

[২০] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ এপ্রিল, ১৯৫০, রবিবার, ৩ বৈশাখ, ১৩৫৭, ৯০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৯।

নামাজি মেডিকেল ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ঘোষণা

নারীদেরকে শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসাহ দেয়ার জন্য অনেক আগে থেকেই বৃত্তি চালু করা হলেও পাকিস্তান আমলে নামাজি মেডিকেল ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি চালু করা হলে নারীদের মধ্যে পড়ালেখার পাশাপাশি ধর্মীয় চেতনাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কারণ বৃত্তি পাওয়ার জন্য পড়ালেখার পাশাপাশি নামাজি হতে হবে এবং কোরআন তেলাওয়াত করতে পারতে হবে বিজ্ঞাপনে এমনটাই উল্লেখ ছিল এবং এমন কেউ যদি থেকে থাকে যে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে না তাকে কোরআন তেলাওয়াত শিখতে হবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে এই মর্মে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে হবে।

১৯৫২ সালে "**পাকিস্তান মহিলা সম্মেলন**" নামে বিশাল বড় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

জাতীয় প্রবাহ
মৌলভী মোকাদ্দছ আলী সাহেব প্রণীত
মূল্য—১॥০ টাকা মাত্র
এজেন্ট, রশিদীয়া লাইব্রেরী
৫৯।৫, ইসলামপুর, ঢাকা

ঢাকা প্রকাশ

৯১ বর্ষ ৪৮শ সংখ্যা] ২৪শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৮ সন। 6th April, Sunday, 1952.

পাকিস্তান মহিলা সম্মেলন

কয়েকদিন পূর্ব্বে লাহোরে নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানের মহিলা প্রতিনিধি ছাড়াও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, মিশর, লেবানন, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ। পাঁচ দিন ব্যাপী এই সম্মেলন চলিয়াছিল। ইহাতে প্রতিনিধি ও দর্শক মিলিয়া প্রায় পাঁচ শত মহিলা যোগদান করেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বিরাট মহিলা সম্মেলন। এইরূপ বিরাট ও ব্যাপকভাবে আর কোন মহিলা সম্মেলন পাক-ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। বেগম লিয়াকত আলী খান এই সম্মেলন আহ্বান করেন ও পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ ইহার উদ্বোধন করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান মহিলা সমিতির জন্ম হয় এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট পুষ্টিলাভেই গড়িয়া উঠে। ইহার শাখা পাকিস্তানের প্রত্যেক প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও দেশ সেবার কাজে দেশের মহিলাদের ... প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে; এবং হয়ত পৃথিবীর সকল দেশের নারী ইহার সভ্য হইয়া এই প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ব প্রতিষ্ঠান করিয়া গড়িয়া তুলিবে। পৃথিবীর সমস্যা-নারী জাতির সমস্যা-সমাজ গঠন সমস্যা-তার নৈতিক সমস্যা প্রভৃতি সমস্যাগুলিকে এই মহিলা সমিতির একদিন হয়তঃ সমাধান করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। পৃথিবীর শান্তি হয়ত একদিন এই সমিতিই চেষ্টায় ফিরাইয়া আনা যাইবে কে জানে!

এই সম্মেলনে এ বার সমস্যাগুলিকে বিস্তার ভাবে আলোচনা করিবার জন্য বিদেশী প্রতিনিধি ও পরিদর্শক বর্গকে চারিটি গ্রুপে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়; যথা:—শিক্ষা, অর্থনৈতিক, উন্নয়ন, শিল্প ও সংস্কৃতি! ইহা ছাড়া এই সম্মেলনে নারীর সকল প্রকার সমস্যা আলোচনা করা হয়। দেশের কুসংস্কার ও অশিক্ষা দূর করিবার জন্য ও নারীদের আহ্বান করা হয়। দেশে দেশে নারীদের গৃহ কোণ থেকে বাহিরের আলোতে আসা এই কাজের একান্ত প্রয়োজন। এই সুন্দর পৃথিবী, পৃথিবীর আলো ও বাতাস নারীদের আহ্বান জানাইতেছে। তারা আসুক জীবনী শক্তি সংগ্রহে, দেশের মলিনতা ও অশান্তি দূর করিবার জন্য পুরুষের সঙ্গে উপযুক্ত সহ-কর্ম্মী রূপে এই কামনা আমরা করিতেছি।

...মিশরের ... অপর একটি ... যে, পাকিস্তানে ... কারুকের ... এই ব্যাপারে ... কথা বিবেচনা ... জনাব ... জনাব ... মার্কিন যুক্ত... নাই এবং ... মধ্যে কোন ... সরকার ... এই সম্প... একটা সংবাদে ... যে, ওয়াশিংটন ... গোপন চুক্তি ... করিয়াছেন। কোন্ দেশের ... মোটেই ... শান্তিপূর্ণ ...[21]

ঢাকা প্রকাশ (৬ এপ্রিল, ১৯৫২, ২৪ চৈত্র, ১৩৫৮)

১৯৫২ সালে "**পাকিস্তান মহিলা সম্মেলন**" নামে বিশাল বড় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। আবার **১৯৫২** সালের ৬ এপ্রিল **প্রবেশিকা পাশ মহিলাদের লেকচারার পদ প্রার্থনা** শিরোনামে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

---

[21] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ এপ্রিল, ১৯৫২, ২ চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ৯১ বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা।

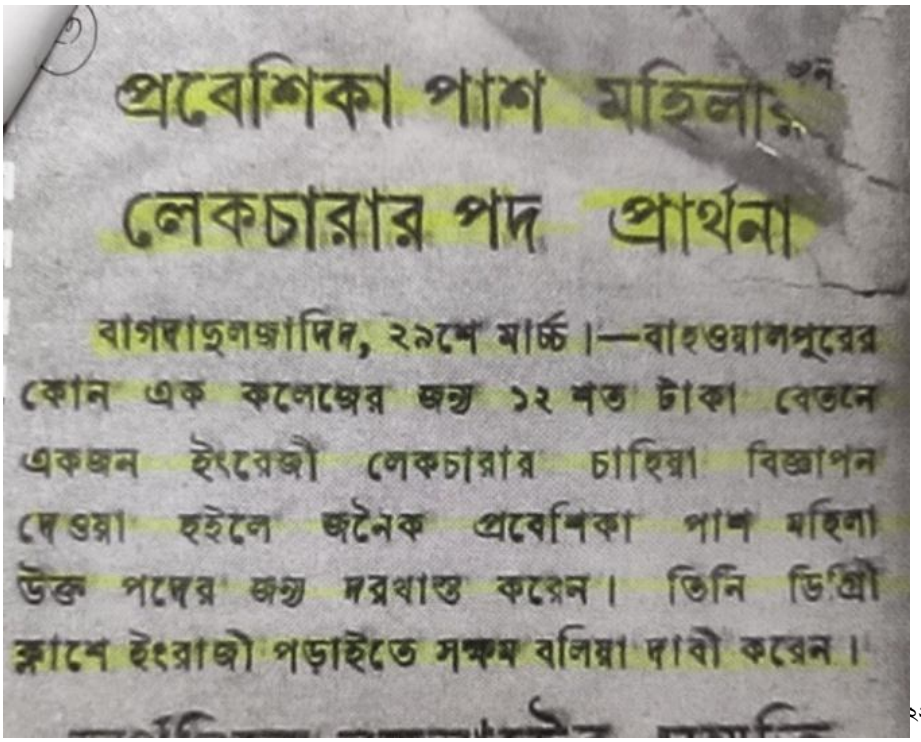

প্রবেশিকা পাশ মহিলার
লেকচারার পদ প্রার্থনা

বাগদাদুলজাদিদ, ২৯শে মার্চ্চ।—বাহওয়ালপুরের কোন এক কলেজের জন্য ১২ শত টাকা বেতনে একজন ইংরেজী লেকচারার চাহিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে জনৈক প্রবেশিকা পাশ মহিলা উক্ত পদের জন্য দরখাস্ত করেন। তিনি ডিগ্রী ক্লাশে ইংরাজী পড়াইতে সক্ষম বলিয়া দাবী করেন।

[২২]

ঢাকা প্রকাশ (৬ এপ্রিল, ১৯৫২, ২৪ চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ৯১ বর্ষ, ৪৮ শ সংখ্যা)।

প্রবেশিকা পাশ মহিলার লেকচারার পদ প্রার্থনা

এমন বিজ্ঞাপন ইতিপূর্বে লক্ষ করা যায়নি। নারীদের অগ্রযাত্রায় *ঢাকা প্রকাশের* ইতিবাচক মনোভাবই এর প্রমাণ বহন করে। নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। এজন্য তারা শুধুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেই খুশী ছিল না, শিক্ষা দান করার যোগ্যতাও যে অর্জন করেছিল এই বিজ্ঞাপন তারই প্রমাণ দেয়।

তবে নারীদের খবর এর আগেও *ঢাকা প্রকাশ* অনেক ভাবেই প্রচার করেছে। প্রথম দিকে খুব গুরুত্বহীনভাবে খুব অল্প পরিসরে ছোট ছোট জায়গা নিয়ে অত্যাচার এবং নিগ্রহের স্বীকার নারীদের খবর প্রকাশিত হলেও ধীরে ধীরে নারীদের প্রতি ইতিবাচক খবরও আমরা দেখতে পাই। তবে নারীচিত্র সংবলিত বিজ্ঞাপন ব্রাহ্মদের সময়ও দেখা যায় না এবং মুসলমানদের সময়ও দেখা যায় না। তবে রক্ষণশীল হিন্দুদের সময়ে নারী চিত্র সংবলিত অসংখ্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে এবং নারীদেরকে বেশ আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তবে সবচেয়ে অবাক বিষয় হচ্ছে, যে সকল বিজ্ঞাপন নারী সংশ্লিষ্ট নয় সে সকল বিজ্ঞাপনেও নারী চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। নিচে *ঢাকা প্রকাশ* থেকে সংগৃহীত ছবি সংযোজিত হলো :

[২২] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ এপ্রিল, ১৯৫২, ২ চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ৯১ বর্ষ, ৪৮ শ সংখ্যা।

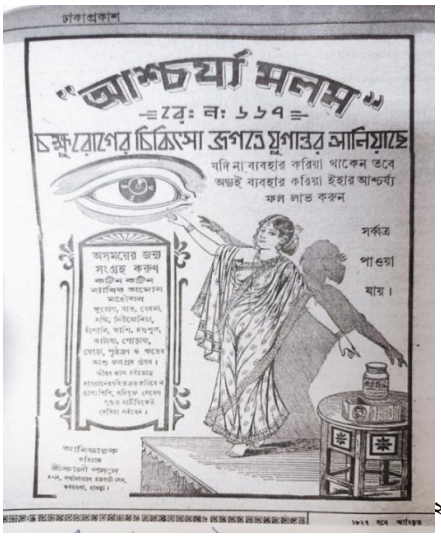
[২৩]

ঢাকা প্রকাশ (৫ জানুয়ারি, ১৯৩৬ খ্রি.)

নৃত্যরত নারীচিত্রে চোখের মলমের বিজ্ঞাপন

চক্ষু রোগের চিকিৎসার জন্য মলমের বিজ্ঞাপনে নারীর ছবি দেয়া হয়েছে এবং এখানে একজন নারীকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার কারণ তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং পাঠককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা। কারণ চক্ষুরোগের সাথে শুধু নারীর তো কোনো সম্পর্ক নেই। ব্লাউজবিহীন শাড়িতে এবং অনেক অলংকার পরিহিত নারীচিত্র দেখা যাচ্ছে ছবিতে।

এমন আরও অনেক বিজ্ঞাপন রয়েছে যেখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নারী চিত্রের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। যেমন– ১৯২৮ সালে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের বিজয় বটিকার একটি বিজ্ঞাপনে নারীকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে বিজ্ঞাপনটি দেয়া হয়েছে।

[২৪]

ঢাকা প্রকাশ (৩০ ডিসেম্বর, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ)

[২৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ জানুয়ারি, ১৯৩৬, ২ পৌষ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৭৫ বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, পৃ. ৮।
[২৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯২৮, ১৫ পৌষ, রবিবার, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৬৮ ভাগ, ৩৩শ সংখ্যা, পৃ. ৬।

নারীচিত্রে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের বিজয়া বটিকা

ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর শুধুমাত্র নারীদের হয়ে থাকে এমন তো কোনো বিষয় নেই। এখানেও পাঠককে আকৃষ্ট করার এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়েই নারী চিত্রের এমন ব্যবহার করা হয়েছে। নারীটিকে লম্বা খোলা এবং কোকড়া চুলে দেখা যাচ্ছে। শাড়ির সাথে এখানে ব্লাউজের ব্যবহার করা হয়েছে এবং হাতে আছে চুড়ি। উল্লেখ্য, সেসময় নারীচিত্রে নারীদেরকে সবসময় লম্বা চুল এবং হাতে চুড়ি দেখানো হতো।

১৯৩০ সালে **অমৃতাঞ্জন শিরোনামে** আরেকটি নারী চিত্র সংবলিত বিজ্ঞাপন ছিল। যেখানে শুধুমাত্র নারীদের ছবি ব্যবহার ছিল নিষ্প্রয়োজন।

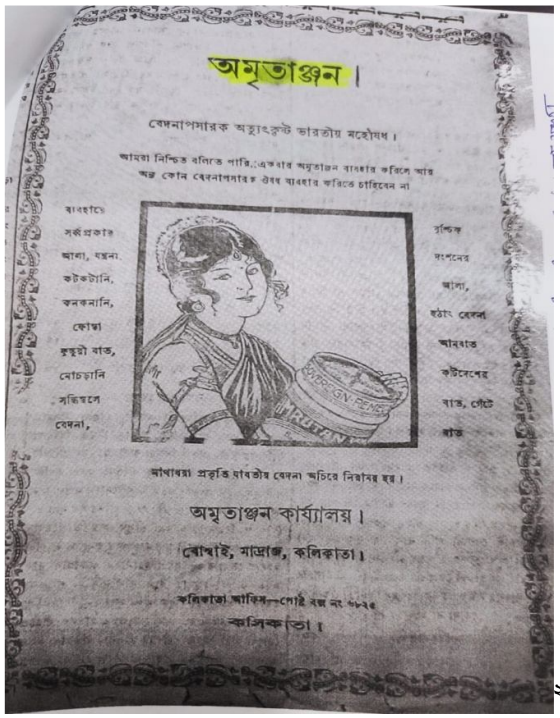
[২৫]

ঢাকা প্রকাশ (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩০)

অমৃতাঞ্জন হাতে সুন্দরী নারী

এখানে নারীকে খুব সুন্দর করে সাজগোজ অবস্থায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি ছিল সবরকম বাত, ব্যথা উপশমকারী ঔষধ। শুধু নারীচিত্র ব্যবহারের এখানেও বাণিজ্যিক কারণটাই লক্ষণীয়।

আরেকটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় **মেহরোগের বামের**। সেখানে লেখা আছে এটি নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই খুবই কার্যকরী ঔষধ। কিন্তু শুধুমাত্র নারী চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

[২৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩০, রবিবার, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭০ ভাগ, ৩০ তম সংখ্যা, ৭।

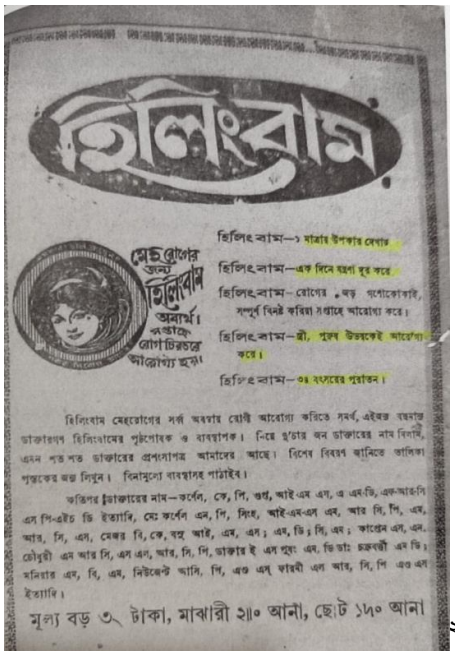

[২৬]

ঢাকা প্রকাশ (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০)

নারীর মুখশ্রীযুক্ত হিলিংবামের বিজ্ঞাপন

সেখানে লেখা আছে এটি নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই খুবই কার্যকরী ঔষধ। কিন্তু শুধুমাত্র নারী চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এটির ক্ষেত্রেও বলা যায় আগের মতোই নারীদেরকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

১৯৬৬ সালের ৫ জানুয়ারি সংখ্যায় Sunlight soap এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

[২৭]

ঢাকা প্রকাশ (৫ জানুয়ারি, ১৯৩৬)

[২৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০ খ্রি., ১১ ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪১ সংখ্যা, ৬৯ ভাগ, পৃ. ৬।
[২৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯৩৬ খ্রি., ২০ পৌষ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৭৫ বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, পৃ. ৬।

কথোপকথনরত দুইজন নারীচিত্র সংবলিত সাবানের বিজ্ঞাপন

কাপড় ধোয়ার একটি সাবান এটি। যেখানে দুইজন নারীকে কথোপকথনরত অবস্থায় প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রথম চিত্রে দেখানো হয়েছে তারা দুইজন চা খেতে খেতে গল্প করছে আর অন্যজনের কাপড়চোপড় দেখে অবাক হচ্ছে যে তার কাপড়চোপড় এত পরিষ্কার কিভাবে হয়। তখন সে পরামর্শ দেয় সানলাইট সাবান ব্যবহার করার জন্য। একই বিজ্ঞাপনের নিচে আরেকটি চিত্রে দেখা যায় ব্যবহার করার পরে, যে নারী জিজ্ঞাসা করেছিল সে ঘরের কাজ করতে থাকা অবস্থায় খুব নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দেয় তুমি আমাকে অনেক উপকার করেছ সানলাইট সাবান ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে এটা অনেক ভালো ইত্যাদি।

ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত খবরসমূহ

ঢাকা প্রকাশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রচনাভিত্তিক সংবাদ ছাপা হতো। কিছু ছোট ছোট সংবাদ ছাড়া একটি সংবাদ বা বিষয় কেন্দ্রিক বিস্তারিত আলোচনা বা মতামত থাকতো সেখানে। গুরুত্বের সাথে ছাপা হতো স্থানীয় খবর এবং পাশাপাশি বিদেশি সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত খবরসমূহও এবং মফস্বল থেকে প্রেরিত বিভিন্ন চিঠিপত্র আসত ছাপানোর জন্য। তবে সম্পাদকরা মূলত বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন রচনা বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মতামত তুলে ধরতেন। নিজস্ব মতামত প্রকাশ করলেও সম্পাদকরা জমিদার, রায়ত এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক এ সকল বিষয় নিয়েই কলামগুলো সাজাতেন। *ঢাকা প্রকাশ* ইংরেজদের শাসন প্রশাসন নিয়েও অনেক ধরনের মন্তব্যই করতেন। ব্রাহ্ম, হিন্দু বা মুসলমানদের সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকলেও কিছু অন্তর্গত মিলও আবার ছিল। যে সকল সাধারণ বিষয় *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় সর্বাধিক হারে প্রকাশিত হয়েছে বা স্থান করে নিয়েছে সেগুলো হচ্ছে- সমাজসংক্রান্ত সাধারণ চিন্তাভাবনা, সমাজে নারীদের স্থান, বিধবা নারীদের করুণ অবস্থা, পুরুষদের বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, নারী শিক্ষা, নারী প্রগতি এবং বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। এ সকল অনেক বিষয় নিয়েই সংস্কারবাদীরা আন্দোলন করলে সরকার তাদের পক্ষেই রায় ঘোষণা করেন, যেগুলো পত্রিকাটি দেখলে আমরা সহজেই ধারণা লাভ করতে পারি। তাই বলা যায় পত্রিকার অবস্থান সংস্কারবাদীদের পক্ষে ইতিবাচকভাবে ছিল।

সমাজ নিয়ে *ঢাকা প্রকাশের* চিন্তা সম্পর্কে আমরা ধারণা পাই ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত *ঢাকা প্রকাশের* বক্তব্য থেকে। সেখানে পত্রিকাটি বলেছিল সবাই শুধু রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যদি সমাজ নিয়ে চিন্তা করতো তাহলে সমাজের অনেক বেশি উন্নয়ন সম্ভব হতো। যেমন- একজন

বাল্য বিধবার করুণ জীবন কাহিনি সম্পর্কে অনুধাবন করার জন্য জনগণকে গভীর উপলব্ধি করতে বলা হয়েছে। কি কঠিন জীবন সে নারীর কপালে জোটে এ বিষয়ে *ঢাকা প্রকাশের* ইতিবাচক মনোভাব দৃষ্ট হয়।[২৮] যে সকল পুরুষরা বহুবিবাহ করে তার নেতিবাচক প্রভাব সমাজের ওপরও পড়ে এ বিষয়ে পত্রিকাটি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এ থেকেও পত্রিকাটির নারীদের পক্ষেই মনোভাব দৃষ্ট হয়। নারী বিধবা হলে তার সারা জীবন কতটা কষ্টে কাটে এই চিন্তা করে বিধবা বিবাহের পক্ষেও *ঢাকা প্রকাশ* অবস্থান নেয়। *ঢাকা প্রকাশে* নিয়মিত বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ নিবারণ, বাল্যবিবাহ, কুলীন প্রথা রদ প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো।

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা যখন ব্রাহ্মদের অধীনে ছিল তখন তারা বিধবা বিবাহের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন কিন্তু যখন তা রক্ষণশীল হিন্দুদের অধীনে আসে তখন তারা এই মতের বিরোধিতা করে সংবাদ প্রচার করতে থাকে। নারী জাতির কল্যাণের প্রতি আগ্রহ এবং মমতা ছিল বাঙালি সমাজজীবনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।[২৯] তবে স্ত্রী স্বাধীনতার বিপক্ষে মত প্রকাশ করে *ঢাকা প্রকাশ* ১৮৭৫ সালের দিকে। এ মতের পক্ষে অবস্থান নিয়ে *সোমপ্রকাশ*ও মন্তব্য পেশ করেন তাদের পত্রিকায়।[৩০] ব্রাহ্মণদের অধীনে থাকা অবস্থায় *ঢাকা প্রকাশ* দূষিত গঙ্গাযাত্রাপ্রথা উঠিয়ে দেয়ার পক্ষে মত পোষণ করেন।[৩১] সবচেয়ে বৈপ্লবিক উক্তি বোধ হয় ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ করেছিলেন যে, বিধবার গর্ভসঞ্চার হলেও তাকে হত্যা না করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৩২]

ঢাকা প্রকাশের গঠনগত পরিবর্তন এবং বিজ্ঞাপনচিত্র

ঢাকা প্রকাশের শুরুর দিকে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে *ঢাকা প্রকাশ* লেখা ছিল। তার নিচে ছোট করে সাপ্তাহিক ও তার নিচে **সিদ্ধি সাদ্ধে সমামুস্ত** এই সংস্কৃত বাক্য লেখা এবং তার নিচে দাগ দেয়া ছিল। দাগের নিচে বাম পাশে লেখা থাকতো ভাগ এবং সংখ্যা তারপর বাংলা সন ও তারিখ, তারপরে বারের নাম, পাশে ইংরেজি সন ও তারিখ এবং একদম ডানে থাকতো বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৮ টাকা। এ সময় *ঢাকা প্রকাশের* মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২।[৩৩] বড় কোনো শিরোনামে খবর প্রকাশ হতো না এ সময়। কলামভিত্তিক খবর প্রকাশ হতো। অল্প জায়গায় ছোট

---

[২৮] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলা সংবাদ সাময়িক পত্র*, পৃ. ১৫।
[২৯] স্বপন বসু, *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১২০।
[৩০] বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা, পৃ. ৩২৪।
[৩১] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ এপ্রিল, ১৮৭২।
[৩২] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ এপ্রিল, ১৮৬৬।
[৩৩] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র-২*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা -২০০৪, পৃ. ২৫।

ছোট করে ভেতরে অনেক খবর প্রকাশ হতো। পড়ে বুঝে নিতে হতো আলাদা আলাদা খবর আছে সেখানে। তারপরও কিছু নির্দিষ্ট শিরোনাম এই সময়ের সংখ্যায় দেখা যায়। সেগুলো হলো বিজ্ঞাপন, *ঢাকা প্রকাশ*, সংবাদাবলি, প্রেরিত। এ সময় প্রথম পৃষ্ঠাতেই বিজ্ঞাপন দেয়া হতো এবং সেগুলো লিখিত বিজ্ঞাপন ছিল। চিত্রসম্বলিত কোনো বিজ্ঞাপন সে সময় দেখা যায় না এবং কোনো নারী চিত্রসংবলিত বিজ্ঞাপনও দেখা যায় না। প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতে যে সকল গ্রাহকের নিকট *ঢাকা প্রকাশের* মূল্য বাকি আছে তা পরিশোধ করতে বলা হতো।

১৮৬৪ সালের পত্রিকায় ঢাকায় বিক্রয়ার্থ গৃহ, আইনের বইয়ের বিজ্ঞাপন, লাইব্রেরি স্থাপনে অর্থ সহযোগিতা চেয়ে বিজ্ঞাপন, বই চেয়ে বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বিজ্ঞাপন দেখা যায়। পত্রিকায় লাইব্রেরি চেয়ে বিজ্ঞাপন এবং বই চেয়ে বিজ্ঞাপন দেখে ধারণা করা যায় তৎকালীন সমাজে শিক্ষা বিষয়ে জনগণের আগ্রহ ছিল।[৩৪]

১৮৭১ সালের দিকে পত্রিকার গঠনে হালকা একটু পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতে *ঢাকা প্রকাশ* বড় করে লেখা থাকে, এর ওপরে লেখা রেজিস্ট্রি করা এবং রেজিস্ট্রি নম্বরটি লেখা। *ঢাকা প্রকাশের* নিচে সাপ্তাহিক লেখা এবং তার নিচে সিদ্ধিঃ সাধ্যে সমামুস্ত ও নিচে দাগ দিয়ে তার নিচে বাম থেকে ডানে যথাক্রমে ভাগ ও সংখ্যা, বাংলা সন ও তারিখ এবং একদম ডানে বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত কত টাকা তা থাকে। এ সময়ও পত্রিকা ব্রাহ্মদের অধীনে ছিল। প্রথম পৃষ্ঠায় থাকতো বিজ্ঞাপন। *ঢাকা প্রকাশ* শিরোনামে খবর প্রকাশ হতো। পত্রিকায় থাকতো পুস্তক সমালোচনা, সংবাদাবলি, প্রেরিত পত্র (যা মান্যবর শ্রীযুক্ত *ঢাকা প্রকাশ* সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে পাঠানো হতো)। *ঢাকা প্রকাশ* সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম শিরোনামে পত্রিকার সকল নিয়মকানুন থাকতো। ১৮৭১ সালের পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপনের সংখ্যা আরেকটু বেশি দেখা যায়। কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখা যায়। চাকরির বিজ্ঞাপন সে সময় পত্রিকার মাধ্যমেই দেয়া হতো। ১৮৭২ সালের পত্রিকায়ও অনেক বিজ্ঞাপন দেখা যায়। পত্রিকা প্রকাশের শুরুর দিকে বিজ্ঞাপন অনেক বেশি না থাকলেও ধীরে ধীরে বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বাড়তে দেখা যায়। পত্রিকা চালানোর খরচ নির্বাহ করা সম্পাদকের জন্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ ছিল। এজন্য হয়তো বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করেছে *ঢাকা প্রকাশ*। ১৮৭২ সালের বিজ্ঞাপনগুলো ছিল মূল্য পরিশোধের বিজ্ঞাপন, গিরিশ বস্ত্রালয়, স্কুলের চৌকি বিক্রি হবে সেটির বিজ্ঞাপন এবং ডাক্তার নিজেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সুলভ মূল্যে চিকিৎসা এবং ঔষধ দেয়া হবে।

[৩৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ২ জুন, ১৮৭১ খ্রি, ১০ম ভাগ, ৪৩শ সংখ্যা।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনচিত্রের ভূমিকা

বই পুস্তক সংক্রান্ত অনেক বিজ্ঞাপন *ঢাকা প্রকাশে* দেখা যায়। সেখানে গরিব ছাত্রদের সমাজের ধনী ব্যক্তি কর্তৃক সাহায্যের কথা এবং তাদের কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপনের আকারে প্রকাশ হতো। ধনীরা যাতে বিজ্ঞাপন দেখে মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন এই উদ্দেশ্যেও বিজ্ঞাপনগুলো দেয়া হতো। পত্রিকায় ছাত্রদের বৃত্তির বিজ্ঞাপনও দেখা যায়। ছাত্রদেরকে পড়ালেখায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এত আগেও বৃত্তির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাই খুব সহজেই বলা যায় *ঢাকা প্রকাশ* ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার পক্ষে ছিল। এ সময়ে পত্রিকায় বইয়ের বিজ্ঞাপনও দেখা যায়। কার কাছে এবং কোথায় বই পাওয়া যাবে তার নাম, ঠিকানা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। যারা বই কিনতে আগ্রহী তারা ডাকযোগে বই কিনতে পারতো। বইয়ের লাইব্রেরি খুব বেশি সহজলভ্য ছিল না সেসময়, তাই বিজ্ঞাপন প্রচলিত ছিল। বই বিক্রির বিজ্ঞাপন ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেওয়া হলেও এটি শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। ১৮৭১ সালে ঢাকা ও বিক্রমপুর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসসমূহ (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো এবং প্রতিটি শ্রেণির জন্য কোন বই এবং কোন লেখকের বই পড়তে হবে এগুলোরও নাম পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এ সময়ও পত্রিকায় কোনো সচিত্র বিজ্ঞাপন এবং নারী চিত্রসংবলিত বিজ্ঞাপন দেখা যায় না। পত্রিকার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২। পত্রিকার শেষে লেখা থাকতো- এই সাপ্তাহিক পত্র প্রতি রবিবার ঢাকা-বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রিন্টার শ্রীলছমন বসাক কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৩৫]

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা

কোথায় কোন ডাক্তার পাওয়া যাবে সে সময় ডাক্তাররা নিজেদের পরিচিত করানোর জন্য পত্রিকাকেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতেন। পত্রিকায় সে সময়ে বইয়ের বিজ্ঞাপন ভালো পরিমাণেই লক্ষ করা যায়। পাঠ্যবই বিক্রির বিজ্ঞাপন এবং কোথায় পাওয়া যাবে তার মূল্য ও ঠিকানা সহ দেয়া ছিল। এই সংখ্যায় টাকা হারানোর বিজ্ঞপ্তি এবং কেউ পেলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে বলেও আশ্বস্ত করা হয়েছিল। ১৮৭৩ সালের সংখ্যাগুলোতে যে সকল চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেখা যায়- ঔষধের বিজ্ঞাপন, ইন্ডিয়ান টুথ পাউডার, ধাতু দুর্বলতার ঔষধ ইত্যাদি। ঔষধের বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি প্রসাধনের বিজ্ঞাপনও দেখতে পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ে পত্রিকার মাধ্যমে ঔষধ বিক্রি প্রচলিত ছিল ব্যাপক হারে। কারণ পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাতেই কোনো না কোনো রোগের জন্য ঔষধের বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

---

[৩৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ৮ পৌষ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ১ জানুয়ারি, ১৮৭১ খ্রি., ১০ম ভাগ, ৪৩শ সংখ্যা।

১৮৭৫ সালের সংখ্যাগুলোতে যে সকল বিজ্ঞাপন দেখা যায় তা বিশ্লেষণ করে ধারণা করা হয় সে সময় চিকিৎসার জন্য পত্রিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। কারণ একই সাথে একটি পত্রিকার মধ্যে বিভিন্ন রোগের অব্যর্থ ঔষধ এর বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। মূল্য ফেরত সহ গ্যারান্টি দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হতো। ডাক্তার না দেখিয়েই সে সকল রোগের চিকিৎসা নিতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে *ঢাকা প্রকাশের* অবস্থান শীর্ষে ছিল যেহেতু পত্রিকাটি দীর্ঘদিন ধরে এই বিজ্ঞাপনগুলো প্রকাশ করেছে। সেসময় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপকভাবে আধুনিক পরিবর্তন হতে থাকে। বিভিন্ন রকম চিকিৎসা পদ্ধতি চালু হতে থাকে। আয়ুর্বেদিকের পাশাপাশি এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারও প্রসার ঘটে।

১৮৭৫ সালের পত্রিকায় যে সকল বিজ্ঞাপন দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে কর্মখালির বিজ্ঞাপন, ধাতু দুর্বলতার ঔষধ, সাদা চুল কালো করার বিজ্ঞাপন, হিমসাগর তৈল, অর্শ রোগের মহৌষধ, কুষ্ঠ রোগের মহৌষধ, টুথ পাউডার, বইয়ের বিজ্ঞাপন, ওলা উঠা রোগের মহৌষধ, জমিদারি ও মহাজনি হিসাবের বিজ্ঞাপন, প্লীহা, কালাজ্বর ও দাউদের ঔষধের বিজ্ঞাপন। এ সময় কি ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এ বিজ্ঞাপনগুলো দেখলে। ধাতু দুর্বলতা, কুষ্ঠ রোগ, ওলা উঠা রোগ, প্লীহা, কালাজ্বর, দাউদ ইত্যাদি রোগ যে ব্যাপক হারে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এ সকল বিজ্ঞাপন জনগণকে আশ্বস্ত করতে পেরেছিল এবং রোগের মহামারি কমাতে পেরেছিল।[৩৬]

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনই পত্রিকা জুড়ে থাকতো। মোটামুটি সকল ধরনের রোগের চিকিৎসাই পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন আকারে দেয়া হতো। সে সময় ওই রোগগুলো ব্যাপক হারে সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা *ঢাকা প্রকাশ* তুলে ধরেছিল।

ঢাকা প্রকাশের সর্বাধিক সংখ্যায় যে রোগের চিকিৎসার বিজ্ঞাপনগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে দাউদ, পুরুষের ধাতু দুর্বলতা, অর্শরোগ, কুষ্ঠ রোগ, ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, স্ত্রীরোগ ইত্যাদি। ১৯২০ সালের পর থেকে কলেরা রোগের ট্যাবলেট এর বিজ্ঞাপন দেখা যায়। সে সময় কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল তাই জনগণকে এ রোগ থেকে বাঁচানোর জন্য এ ট্যাবলেট আবিষ্কার হয় সেসময়। এছাড়াও আরো অনেক রোগের ঔষধের বিজ্ঞাপন ছিল। নবীন অবলেহ (সকল প্রকার উদরাময় রোগের অব্যর্থ মহৌষধ), অমৃতাসর (সকল প্রকার কাশি রোগের বিশেষ ঔষধ), চন্দনাসব (সর্বপ্রকার মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ), অঙ্গমঞ্জুরি তৈল (মাথা ধরা,

[৩৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ জানুয়ারি, ১৮৭৫ খ্রি, ৫ মাঘ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ, ১৪ শ ভাগ, ৪১শ সংখ্যা।

মাথা ব্যথা, মাথার সমস্ত রোগ দূর, চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়), যোগসিদ্ধ রস (সকল প্রকার মেহ রোগ ৭ দিনে আরোগ্য হয়)।[৩৭] হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারও বিজ্ঞাপন দেয়া হতো অনেক, হোমিও ডাক্তারের নামও বিজ্ঞাপন দেয়া হতো।[৩৮]

নারীদের চিকিৎসায় বিজ্ঞাপনচিত্রের ভূমিকা

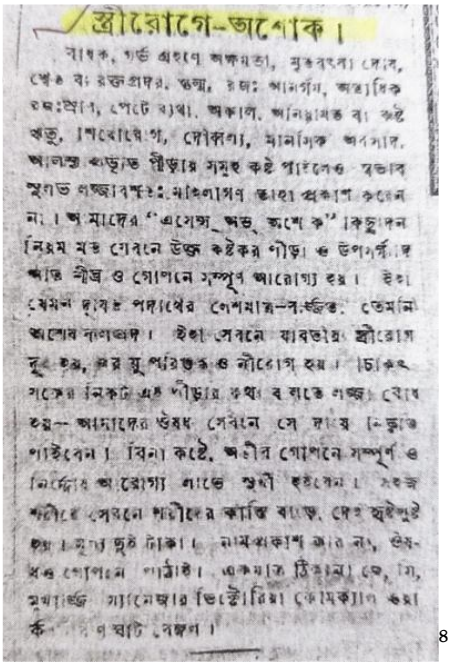

নারীদের জন্য অনেক স্ত্রীরোগের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেয়া হতো এবং বিজ্ঞাপনে ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানাও থাকতো। যারা ঔষধ নেবে তাদের নাম গোপনীয় রাখা হবে বলেও বিজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকতো। নারীরা যাতে বিব্রতকর পরিস্থিতির স্বীকার না হয় এ কারণে গোপনীয়তা রক্ষা করা হতো।[৩৯] উল্লেখযোগ্য স্ত্রীরোগের চিকিৎসার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রদরারী ঘৃত (সকল প্রকার শ্বেতরোগ, বাধক, গর্ভপাতের ব্যাঘাত নষ্ট করে), সুরমা, অশোক ইত্যাদি। অশোক, সুরমা এগুলোর একটানা অনেক বছর ধরে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। স্ত্রীরোগে অশোকে নারীচিত্র সহ আবার অনেক সময় চিত্র ছাড়াও বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ হতো।[৪০]

[৪১]

ঢাকা প্রকাশ (৭ এপ্রিল, ১৮৯৫ খ্রি.)

---

[৩৭] *ঢাকা প্রকাশ,* ২৫ চৈত্র, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজি ৭ এপ্রিল, ১৮৯৫ খ্রি., ৩৫ চতুর্থ সংখ্যা এবং *ঢাকা প্রকাশ (১৯০০-১৯০৬)* সাল পর্যন্ত পত্রিকাগুলো থেকে নেওয়া।

[৩৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ মাঘ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজি ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০ খ্রি., ২৯শ ভাগ, ৪৩শ সংখ্যা এবং *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ আগস্ট, ১৯২০ খ্রি., ৩০ শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ৬০ ভাগ, ৮শ সংখ্যা।

[৩৯] *ঢাকা প্রকাশ (১৯০০-১৯০৬)* সাল পর্যন্ত পত্রিকাগুলো থেকে নেয়া এবং *ঢাকা প্রকাশ,* ১৫ আগস্ট, ১৯২০ খ্রি, ৩০ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ৬০ ভাগ, ৮শ সংখ্যা।

[৪০] *ঢাকা প্রকাশ (১৯০০-১৯০৬)* সাল পর্যন্ত পত্রিকাগুলো থেকে নেওয়া।

[৪১] *ঢাকা প্রকাশ,* ৪০ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, ২৬ চৈত্র, রবিবার, ইংরেজি ৮ এপ্রিল, ১৯০০ খ্রি., পৃ. ১০।

ঢাকা প্রকাশে হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক এর পাশাপাশি ভেষজ সকল ধরনের চিকিৎসার বিজ্ঞাপনই দিত। ভেষজ চিকিৎসার বিজ্ঞাপন অনেক ব্যাপক পরিমাণে দেখা যায়।

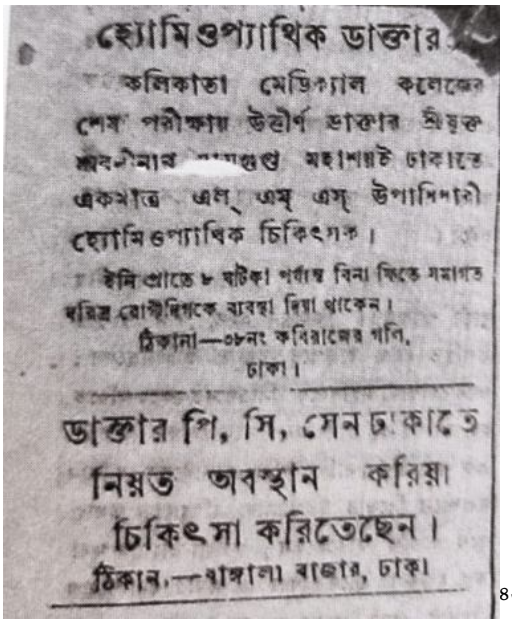

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ই ঢাকাতে একমাত্র এল্ এম্ এস্ উপাধিধারী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

ইনি প্রাতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিনা ফিতে সমাগত দরিদ্র রোগীদিগকে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

ঠিকানা—৩৮নং কবিরাজের গলি, ঢাকা।

ডাক্তার পি, সি, সেন ঢাকাতে নিয়ত অবস্থান করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন।

ঠিকানা—বাঙ্গালা বাজার, ঢাকা

[৪২]

ঢাকা প্রকাশ (১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ)

হিসাব করলে সবচেয়ে বেশি ভেষজ চিকিৎসার বিজ্ঞাপনই দেখা যাবে। যেমন- প্যাটেন্ট ককফিল (গাছ গাছড়ার তৈরি মহৌষধ), নেত্রনীহার (চক্ষুরোগের ঔষধ, জীর্ন মঞ্জুরি, বিজয় বটিকা, পরীক্ষিত সন্ন্যাসীদত্ত মহৌষধ, সন্ন্যাসীদত্ত আশ্চর্য তাবিজ, সুধাবিন্ধু, কামাগ্নি সন্দীপক বটিকা, মকরন্দ সালসা, সর্ব জরাসংকুশ (ম্যালেরিয়া জ্বরের পেটেন্ট ঔষধের মধ্যে নির্বিবাদে শ্রেষ্ঠ), ধজগজেন্দ্র ঘৃত ও বটিকা, অমোঘ মহৌষধ (সর্বপ্রকার ঘা বা ক্ষত রোগের জন্য), সূধাচূর্ণ। ইলেকট্রো গ্যালভানীয় অংগুরি কবজ ও অনন্ত, সোনার অংগুরি, অষ্টধাতু নির্মিত অমোঘ অনন্ত, বিজয় বটিকা, দশনপোষণ চূর্ণ (দাঁত), ইত্যাদি।[৪৩] দেখা যায় বিভিন্ন কবজের বিজ্ঞাপনও পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিল।[৪৪]

নারী বিষয়ক খবরের বৈচিত্র্যতা

ব্রাহ্মদের অধীনে থাকা অবস্থায় পত্রিকায় নারী বিষয়ক অনেক বেশি খবর প্রকাশ না হলেও নারীদের পক্ষে খবর প্রকাশ হতো এতে সন্দেহ নেই। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর কর্তৃক বিধবা

[৪২] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

[৪৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ এপ্রিল, ১৮৮৪ খ্রি., ১৬ বৈশাখ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ২৪শ ভাগ, ৭ম সংখ্যা এবং *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭ খ্রি. সংখ্যা, এবং *ঢাকা প্রকাশ* ২৫ চৈত্র, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, রবিবার সংখ্যা, এবং *ঢাকা প্রকাশ, (১৯০০-১৯০৬)* সাল পর্যন্ত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যাসমূহ।

[৪৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ মাঘ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজি ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০ খ্রি., ২৯শ ভাগ, ৪৩শ সংখ্যা।

বিবাহ আইন পাশ হলে তৎকালীন সময়ের উনিশ শতকের পত্রিকাগুলো বিধবা বিবাহের সমর্থনেই যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকে এবং *ঢাকা প্রকাশ*ও তার ব্যতিক্রম নয়। *ঢাকা প্রকাশ* এই মতের সাথে সমর্থন করে জানায় যে, বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রুণ হত্যার মতো জঘন্য পাপ থেকে নারীরা মুক্তি পাবে।[৪৫] *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা ও বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের সপক্ষে প্রবন্ধ লেখায় হিন্দু সমাজের রোষানলে পড়ে। *ঢাকা প্রকাশ* থেকে ১৮৭৫ সালে লিখেছিল, তারা স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী। এ মতের সমর্থন করে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকাও লেখে যে, স্ত্রী স্বাধীনতা দান করলে পরবর্তীতে অনুতাপ করতে হবে।[৪৬] বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রেও পত্রিকাটির অবস্থান নারী জাতির বিপক্ষে দৃশ্যমান হয়। এটার অবসান হয়েছিল ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর। এই আইনে কনের সর্বনিম্ন বয়স স্থির করা হয়েছিল ১২তে।[৪৭] মধ্যম শ্রেণির লোকজন এর হাতে নিয়ন্ত্রণ ছিল *ঢাকা প্রকাশের*। তাই পত্রিকার চিন্তাভাবনাগুলোও তাদের মতো করেই প্রভাবিত হয়েছে। তবে ব্রাহ্ম বা গোঁড়া হিন্দুদের বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও সুরাপান, বিবাহে খেমটা নাচ, বাবুগিরি পাশ্চাত্যের প্রতি বেশি ঝোঁকের সমালোচনা তারা উভয়েই করতো। এ প্রসঙ্গে *ঢাকা প্রকাশ* ইংরেজদের প্রতি বিরক্ত মনোভাব প্রকাশ করে লিখে যে তাদেরকে এত আদর্শস্থানীয় মনে করার কিছু নাই। আবার মধ্যম শ্রেণির লোক শুধু চাকরির প্রতি ঝোঁক, তারা উদ্যোক্তা বা কৃষিকাজে নিরুৎসাহী কেন তার প্রতিও পত্রিকাটি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।[৪৮]

প্রসাধন ও বিজ্ঞাপনচিত্র

সে সময় প্রসাধনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বোঝা যায় প্রকাশিত অসংখ্য বিজ্ঞাপন থেকে। পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়ই প্রসাধনের বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। তবে প্রসাধনী বলতে সর্বাধিক সংখ্যায় তেলের বিজ্ঞাপনটাই বেশি নজর কাড়ে। পরবর্তীতে নারীদের চুরি, সিল্ক, শাল ইত্যাদির বিজ্ঞাপন নজরে আসে। ১৮৭৫ সালে সর্বপ্রথম পত্রিকায় তেলের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। তবে এই তেল ছেলেমেয়ে উভয়েই ব্যবহার করতে পারে। কারণ এটা যে শুধু নারীদের জন্য এমন কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বিজ্ঞাপনে ছিল না। তাই সহজেই বলা যায় এটি পুরুষরাও ব্যবহার করতে পারত। হিমসাগর তেলের বিজ্ঞাপন ছিল এটি।[৪৯] কোনো ছবি ছিল না এই বিজ্ঞাপনে। পুরুষরা যে

---

[৪৫] স্বপন বসু, *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১২০।

[৪৬] বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা, পৃ. ৩২৪।

[৪৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭ খ্রি.।

[৪৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ নভেম্বর, ১৮৮৭ খ্রি.।

[৪৯] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ জানুয়ারি, ১৮৭৫ খ্রি., ৫ মাঘ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ, ১৪শ ভাগ, ৪১শ সংখ্যা।

সেসময় রূপ সচেতন ছিল তা এত বহুল পরিমাণে তাদের জন্য নির্মিত তেলের বিজ্ঞাপনই প্রমাণ বহন করে। টাক মাথার সমাধানে অনেক তেলের বিজ্ঞাপন *ঢাকা প্রকাশে* প্রকাশিত হয়। **১৮৮২** সালের পত্রিকায় চিকুরবিলাস তৈল (টাক ও অকালপক্কতা দূর হয়), মালতি কুসুম তৈল (টাক আরোগ্য হয়) ইত্যাদি।[৫০]

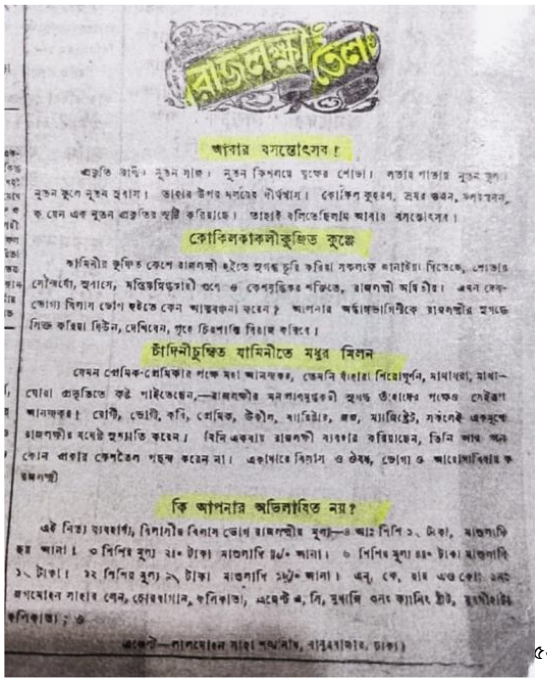

নারীদের প্রসাধনীর জন্যও বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রকমের তেলের বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। যেখানে বর্ণনা করা হতো সুন্দর চুলের অধিকারিণী হলে একজন নারী কতটা সমাদৃত এবং প্রশংসিত হবেন। পরিবারে এবং স্বামীর কাছে তার কদর কতটা বাড়বে সেগুলা বর্ণনা করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হতো। তেলের বিজ্ঞাপনে নারীদের লম্বা চুলের চিত্রসহ বিজ্ঞাপন থাকতো। সেখানে উপস্থাপন করা হতো নারীকে খুবই আকর্ষণীয়ভাবে। শুধু চুল নয় তার শরীরের অবয়বও পত্রিকাতে ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হতো। **কেশরঞ্জন তেল** এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কারণ এই তেলের বিজ্ঞাপনটি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে একটানা পত্রিকাটি প্রকাশ করেছে। **লক্ষ্মীবিলাস তৈল, সুরভি কুন্তলকান্তি তৈল, জবাকুসুম তৈল, জি ঘোষের তিল তৈল, চিকুরীন তৈল, রাজলক্ষ্মী তেল** ইত্যাদি তেলের বিজ্ঞাপনও অনেক বেশি পরিমাণে দেখা যায়।[৫১]

[৫২]

ঢাকা প্রকাশ (১১ আগস্ট, ১৯০৭ খ্রি.)

---

[৫০] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ নভেম্বর, ১৮৭৯ খ্রি., রবিবার, ৮ অগ্রহায়ণ।
[৫১] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ আগস্ট, ১৯২০ খ্রি., ৩০ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ৬০ ভাগ, ৮শ সংখ্যা।
[৫২] *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ আগস্ট, ১৯০৭ খ্রি., ২৬ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ৪৭ ভাগ, ১৮শ সংখ্যা, কলাম ১ম, পৃ. ৭।

রাজলক্ষ্মী তেলের বিজ্ঞাপন

ঢাকা প্রকাশে অনেকবছর ধরে রাজলক্ষ্মী তেলের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। অনেক বিশেষণে বিশেষায়িত করে এই তেলের গুণগান করা হয়। নারীদেরকে আকর্ষণ করে এমনভাবেই বিজ্ঞাপনটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

[৫৩]

ঢাকা প্রকাশ (৪ জুলাই, ১৯২০ খ্রি.)

বাগানে দণ্ডায়মান নারীচিত্রে ফুলেলা কেশ তেলের বিজ্ঞাপন

বি বসু এন্ড কোম্পানির তৈরি কেশ তেল হচ্ছে ফুলেলা। এই বিজ্ঞাপনে নারীচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। দিঘল কালো, ঘন এবং লম্বা চুলে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারীর পরনে ছিল ব্লাউজবিহীন শাড়ি এবং হাতে ছিল চুড়ি। বিজ্ঞাপনে এই তেলকে ফুলের বাগানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে কারণে ফুলের বাগানে অবস্থানরত নারীকে দেখানো হয়েছে। অনেক সুগন্ধিযুক্ত তেল ছিল এটি।

[৫৩] ঢাকা প্রকাশ, ৪ জুলাই, ১৯২০ খ্রি., ঢাকা, ২ আষাঢ়, রবিবার, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ৬০ ভাগ, ১২শ সংখ্যা।

প্রথম সচিত্র বিজ্ঞাপন

ঢাকা প্রকাশে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম সচিত্র বিজ্ঞাপনের দেখা পাওয়া যায়। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ সংখ্যায় **সর্বদদ্রু হুতাশন** (সচিত্র) বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এ বিজ্ঞাপনটি ছিল দাদের ঔষধের। দাদের মহৌষধ বলে দাবি করা এ বিজ্ঞাপনে শঙ্খের ছবি ছিল।[৫৪]

প্রথম নারীচিত্র সংবলিত বিজ্ঞাপন

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় নারীচিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৯০ সালের পত্রিকায়। সেখানে **'পোদ্দারী দোকান'** শিরোনামে অলংকারের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। যেখানে সর্বপ্রথম নারীচিত্র অলংকৃত হয়। চিত্রে দুই পাশে লতা মাঝখানে একটি নারীমূর্তি অলংকার পড়ে দাঁড়িয়ে আছে।[৫৫]

শেষ সময়ে পত্রিকার অবস্থান

১৯৫৫ সালের পত্রিকার সকল সংখ্যায়ই শুধু নিলামের ইশতেহার ছিল। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সকল সংখ্যায়ই নিলামের ইশতেহারে ভরপুর ছিল পত্রিকা।[৫৬] ১৯৫৭ সালে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২, ১৯৫৮ সালে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১টি, যার পুরোটাই নিলামের ইশতেহার ছিল। ১৯৬৯ সালে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা একেক সময় একেক রকম ছিল। কখনো ২, কখনো ৭, কখনো ৫, কখনো ৯ এবং কখনো ১৮ পৃষ্ঠা। পত্রিকা এ সময় ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিল এবং পত্রিকা চালানোর মতো যথেষ্ট টাকাপয়সা ছিল না। ১৯৫৯ সালে পত্রিকার প্রতি সংখ্যার প্রতি পাতার নিচেই সম্পাদকের নাম এবং কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে তা লেখা ছিল। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার জন্য অন্যতম ভূমিকা পালন করে। *ঢাকা প্রকাশের* মতো এত দীর্ঘ সময় ধরে কোনো পত্রিকা টিকে থাকতে দেখা যায়নি। বহুল জনপ্রিয়তার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের খবর এখানে ছাপা হলেও নারীবিষয়ক খবরও এর অন্যতম বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত। তবে পত্রিকার মালিকানা বদলের সাথে সাথে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন হয়েছে যার ফল হিসেবে নারীদের প্রতিও একেক সময় একেক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, *ঢাকা প্রকাশ* পূর্ব বাংলা তথা ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় পত্রিকা। এটি এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, প্রায় ১০০ বছর ধরে এর প্রকাশ অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন

---

[৫৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ মাঘ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খ্রি., ২২শ ভাগ, ৪২শ সংখ্যা।

[৫৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ শে মাঘ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজি ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০ খ্রি., ২৯শ ভাগ, ৪৩ শ সংখ্যা।

[৫৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ এপ্রিল, ১৯৫৫ খ্রি., ২০ চৈত্র, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, ৯৪ বর্ষ, ৪৯শ সংখ্যা।

সময়ে পত্রিকার মালিকানার রদবদল হলেও এটি বন্ধ করে দেয়ার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। ধর্মগত কারণে তাদের মতাদর্শে পার্থক্য দেখা গেলেও পত্রিকা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সবাই ছিল বদ্ধপরিকর। তবে দেশ বিভাগ পরবর্তী সময় এর নেতিবাচক প্রভাব পত্রিকার ওপরও পড়ে। যার ফলস্বরূপ শেষদিকে আর্থিক অনটনে পড়ে যায় পত্রিকা। এর রেশ ধরে মুসলমান সম্পাদক আব্দুর রশীদ খানের সময়ে পত্রিকার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় অধ্যায়

তৎকালীন ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়

ঢাকা এমন এক ঐতিহাসিক শহর যা সকল জাতি, ধর্ম এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মিলন কেন্দ্ররূপে পরিগণিত এবং এ কারণে ঢাকা হয়ে উঠেছে এক নতুন সংস্কৃত নগরী হিসেবে। জীবিকার তাগিদে সকলেই ঢাকায় এসে এক নতুন সংস্কৃত নগরীর জন্ম দিয়েছিল। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ঢাকায় বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও সমাজ উন্নয়নমূলক সমিতি। ঢাকায় ছাপাখানা (১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা) ঢাকার সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সূচনা করে। কারণ এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িক পত্রের উদ্ভব ঘটতে থাকে, এমনকি ঢাকায় এটাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিকদের আবির্ভাবও ঘটে।

একদম শুরু থেকেই পত্রিকাটি তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এসব প্রবন্ধে সমকালীন জীবন ও সমাজ ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নারী শিক্ষা, বাল্যবিয়ে, বিধবা বিয়ে, নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নারী কল্যাণে স্থাপিত বিভিন্ন সংগঠনের কার্যাবলী ইত্যাদি। ফলে পত্রিকাটিকে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে আলোচ্য কাল পর্বের নারীর সাংস্কৃতিক জীবনই শুধু নয়, নারীর সামগ্রিক অবস্থাও পর্যালোচনা করা যায়। তবে এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় এর মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। *ঢাকা প্রকাশ* থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন থেকে নারীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে বিশদভাবে ধারণা লাভ করা যায়।

সংস্কৃতি কি?

সংস্কৃতি কথাটি আমরা প্রতিনিয়ত শুনে থাকলেও এর গভীরতম অর্থ এবং তাৎপর্য আসলে ভেবে দেখা হয় না। কোনো দেশের মানচিত্রে ভূমি, নদী, পাহাড়, বন ছাড়াও অদৃশ্যরূপে উপস্থিত থাকে মানুষের বসবাস চিহ্ন। সংস্কৃতির মানচিত্র ও তাই দৃশ্যমান ও অনুপস্থিত বহু কিছুর সমন্বয়ে বৈচিত্র্যময়। সহজভাবে সংস্কৃতিকে বহুমাত্রিক বলে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু একটি কথা স্পষ্ট যে সংস্কৃতি সর্বদাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দার্শনিকদের মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ, সুরুচি, সৌন্দর্যবোধ ও ঔচিত্যবোধ ইত্যাদি। এই নৈতিকতাকে ঘিরে যথার্থ মানুষের যে সাংস্কৃতিক আচরণ, অভিরুচি, ভাষা ভঙ্গি পোশাক আশাক, সৌন্দর্য প্রীতি ইত্যাদি মিলেই সংস্কৃতি তৈরি হয়। সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ চিৎপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। ইংরেজি কালচার

এর প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি শব্দটি ১৯২২ সালে বাংলায় প্রথম ব্যবহার শুরু হয়।[১] সংস্কৃতি বা কৃষ্টি হলো সেই জটিল সামগ্রিকতা যাতে অন্তর্গত আছে জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, শিল্প, আইন, রাজনীতি, আচার এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষের দ্বারা অর্জিত সামর্থ্য বা অভ্যাস।[২] সংস্কৃতি শব্দটি এসেছে মারাঠা থেকে। বাংলায় কালচার অর্থে সংস্কৃতি শব্দটা প্রস্তাব করলে রবীন্দ্রনাথ এর অনুমোদন দেন। এর আগে বাংলায় কালচার অর্থে কৃষ্টি শব্দটি চালু ছিল।[৩] রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দটা মনে করতেন কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং কালচার অর্থে সংস্কৃতিই উপযুক্ত।

মূলত কোনো স্থানের মানুষের আচারব্যবহার, জীবিকার উপায়, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয় তাই সংস্কৃতি।[৪] সংস্কৃতি হলো টিকে থাকার কৌশল এবং পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সংস্কৃতিবান প্রাণী। মানুষের এই কৌশলগুলো ভৌগোলিক, সামাজিক, জৈবিক সহ নানা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।[৫] পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তর পুরুষেরা এই কৌশলগুলো পেয়ে থাকে। অধিকন্তু সময় ও যুগের প্রেক্ষিতেও তারা কিছু কৌশল সৃষ্টি করে থাকে। তাই বলা যায় সংস্কৃতি যথাক্রমে আরোপিত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিতও বটে।[৬]

নৃবিজ্ঞানী টেইলরের ভাষ্যমতে, সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত নানা আচরণ, যোগ্যতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি, আদর্শ, আইন, প্রথা ইত্যাদির এক যৌগিক সমন্বয় হলো সংস্কৃতি।[৭]

ম্যালিনোস্কির বক্তব্য মতে, সংস্কৃতি হলো মানবসৃষ্ট এমন সব কৌশল বা উপায়, যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে।[৮]

ঢাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতির সাথে আমার আলোচ্য ঢাকা নগরীর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ঢাকাই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা ঢাকা

---

[১] মোঃ হাবিবুর রহমান (১৯৯৭), *একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষায় কথা কয়*, সময় প্রকাশন, পৃ. ২৬।

[২] Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture*, John Murray, Albemarle Street, 1870, p.1

[৩] বদরুদ্দিন অমর, *সংস্কৃতির সংকট*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ২৭।

[৪] এ কে এম শওকত আলী খান (২০১৪), *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, গ্রন্থ কুটির, পৃ. ৪৭।

[৫] Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture*, John Murray, Albemarle Street, 1974, p.1

[৬] এ কে এম শওকত আলী খান (২০১৪), *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, গ্রন্থ কুটির, পৃ. ৪৭।

[৭] তাহমিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.১৮।

[৮] মিসেস আর এস হোসেন, *অবরোধবাসিনী*, *মাসিক মহাম্মদি*, *মহিলা মাহফিল*, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ (১৯৩০ খ্রি.), পৃ. ৭৫১/আরও দ্রষ্টব্য, *রোকেয়া রচনাবলী*, আব্দুল কাদির (সম্পা.) ঢাকা : ১৯৮৫, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯।

নগরীকে সাজিয়েছে বর্নিলরূপে। হাজারো সংস্কৃতি বেষ্টিত এই ঢাকা শহর গৌরবজনক এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। কালের গর্ভে ঢাকা শহরের অনেক ইমারত ধ্বংস হয়ে গেলেও অক্ষত রয়েছে তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি যা এখনো বিদ্যমান। মুঘলদের রাজধানী হিসেবে ঢাকা পরিচিত হলেও এর জনবসতি আরো প্রাচীনকালের। ঢাকার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয় ১৭০৪ সালে। এর ফলে প্রশাসনিক রাজধানী পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ঢাকার ক্ষয় শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ক্ষমতা দখলের পর থেকেই। এ সময় ঢাকা রূপান্তরিত হয় একদমই অস্বাস্থ্যকর এবং নোংরা একটি শহরে। তবে নগরায়ণের ধারায় ঢাকায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে পৌরসভা, আঞ্চলিক ও জেলাভিত্তিক বিভিন্ন সামরিক- বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। ঢাকা পুনরায় ফিরে পায় তার গৌরবোজ্জ্বল দিন। সে সময় ঢাকায় একটি নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা রাজধানী হলে এর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংঘটিত হয়। আবার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে সে উন্নয়নের ধারা একদমই ব্যাহত হয়ে যায়। তবে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমরা পাই আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তখন থেকে ঢাকার শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনেক বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৯] দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহর হিসেবে নির্বাচিত হয় ঢাকা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ঢাকার সংস্কৃতি হুমকির মধ্যে পড়ে যায়। এ সময় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে উচ্চবিত্ত হিন্দুরা এবং রাজা বনে যায় সাধারণ ধনী শ্রেণি যারা ইংরেজ শাসনের সময় প্রচুর সম্পদ তৈরি করেছিলেন। তখন ঢাকায় প্রবেশ করে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে অসংখ্য লোক, যারা মুহাজির নামে পরিচিত। এত লোকের প্রবেশের কারণে ঢাকার সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। ঢাকার সংস্কৃতি ১৯ ও ২০ শতকের দিকে একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করে।[১০]

ঢাকার সংস্কৃতির ইতিহাসে নবাব পরিবারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ঢাকা নবাবদের অধীনে থাকাকালীন সময়ে ঢাকার সংস্কৃতি এবং ঢাকার নারী-সংস্কৃতির অনেক তথ্য পাওয়া যায় ঢাকার নওয়াব পরিবারের ডায়েরি থেকে। সে সময় ঘোড়ার গাড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল ঢাকায়। কোনো মোটরযান চালিত গাড়ি তখন ছিল না। ঘোড়ার গাড়িই আভিজাত্যের প্রতীক ছিল আর ব্যক্তিগত সাইকেল থাকা মানে বিশাল সৌভাগ্যের বিষয় ছিল তখন। ঢাকায় সে সময়ে অনেক ধরনের খেলাধুলা প্রচলিত ছিল। বিনোদনের অংশ হিসেবে সে সকল খেলায় খেলোয়াড়ের

[৯] শায়লা পারভীন, *উনিশ বিশ শতকে পুরানো ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৮।
[১০] শায়লা পারভীন, *উনিশ বিশ শতকে পুরানো ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৯।

পাশাপাশি উপচে পড়া দর্শকের ভিড়ও ছিল। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফুটবল, হকি, মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, মন্দিলা খেলা (ব্রীজ খেলার মতো)। নারী-পুরুষ সবাই এটি খেলতো। মূলত : এটা তুরস্কের একটি খেলা। নবাব পরিবার আর্মেনীয়দের কাছ থেকে এই খেলা শিখেছিল। সঙ খেলাও হতো সে সময়, যা দেখে লোকজন খুব আনন্দ লাভ করতো। নবাব পরিবারের এক সদস্য বিলেত থেকে ক্যারাম বোর্ড নিয়ে আসে । যা তাদের কাছে একেবারেই নতুন ছিল। তখন থেকে ঢাকার ইতিহাসে ক্যারাম বোর্ড খেলার সূচনা দেখা যায়। সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হতো সেসময়। সে সময় ঢাকার হিন্দুরা **'ঝুলন নৃত্য'** পরিবেশন করতো। আরও হতো রথযাত্রা। যেখানে মনিপুরী ও হিন্দু মেয়েরা নৃত্য পরিবেশন করতো। প্রচুর জনসমাগম হতো সেই রথযাত্রায়। জন্মাষ্টমীর মিছিল ছিল ঢাকার সংস্কৃতির বিশেষ আকর্ষণ। বিরাট মিছিল হতো এই সময়। যা দেখতে হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়ে যেত। আরেকটি বিশেষ খেলা ঢাকার সংস্কৃতির অন্যতম একটা অংশ ছিল। সেটার নাম **হারিফি খেলা (ঘুড়ি ওড়ানো),** যে খেলার রেওয়াজ এখনো ঢাকার অনেক অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে রয়ে গিয়েছে।

ঢাকার নবাব পরিবারের যেকোনো অনুষ্ঠান এবং উৎসব উপলক্ষ্যে আহসান মঞ্জিলে করা হতো মনোরম আলোকসজ্জা। আলোকসজ্জা তখনকার সময়েও উৎসবের প্রতীক হিসেবে প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা যায়। আরো প্রচলন ছিল আতশবাজির। যেকোনো মিলাদ মাহফিল বা শুভ কাজের পরে মিষ্টি বিতরণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। যেমন- কোরআন শরীফ শুরু করা এবং খতম করার সময়, বাচ্চাদের খতনা, বাচ্চা হওয়া ইত্যাদি উপলক্ষ্যে। সে সময় শিশুদের প্রথম পাঠ উপলক্ষ্যে বিসমিল্লাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সে অনুষ্ঠানে মিলাদ দেওয়া হতো এবং মিষ্টি বিতরণ করা হতো ।

ঢাকার সংস্কৃতিতে ঈদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। তখনকার সময়ে ঈদের চাঁদ দেখা গেলে ঈদের আগের দিন রাতে ঢোল পিটিয়ে সকল জনগণকে জানানো হতো যে, আগামীকাল ঈদ। ঈদের দিন তারা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতো এবং নামাজ পরবর্তী সময় সকল জনসাধারণকে নবাব আহসান মঞ্জিলে ঈদের খাবার খেতে দিতেন। ঢাকার নবাব পরিবারের ঈদের সাথে নারী জীবনের অনেক সাংস্কৃতিক ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। নবাব আব্দুল গণির দরবারে ঈদের দিনে ঢাকার তৎকালীন সময়ের নামকরা বাইজিরা মনোজ্ঞ নাচ গান পরিবেশন করতো। আন্নু, গান্নু ও নওয়াবীন ছিল নবাব আব্দুল গণির দরবারের নিয়মিত বেতনভুক্ত বাইজি। যারা ঈদসহ যেকোনো অনুষ্ঠানে নাচ, গান পরিবেশন করতো।[১১]

[১১] সোনিয়া নিশাত আমিন, *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৫০।

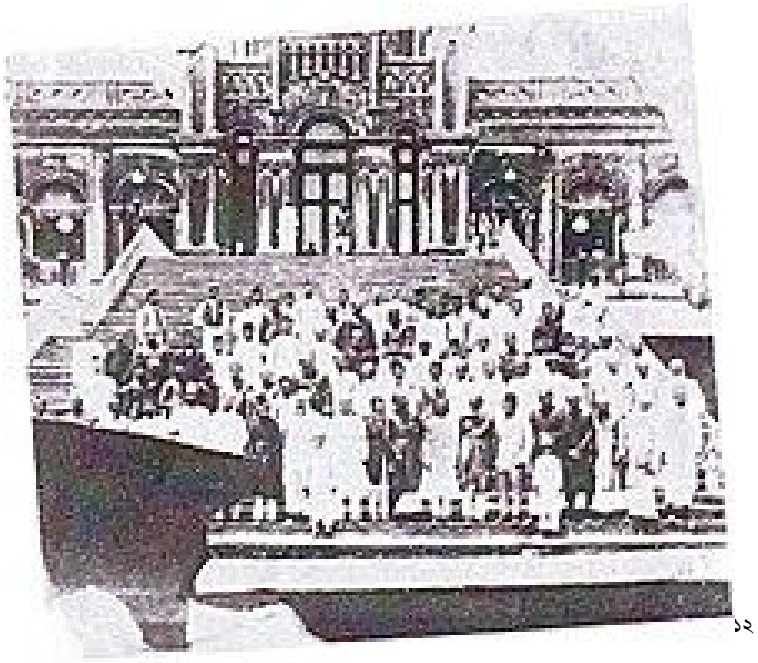[১২]

আহসান মঞ্জিলে পরিবারের সাথে ঈদ পালনরত অবস্থায় স্যার সলিমুল্লাহ্

ঢাকার সংস্কৃতির অনেক বড় অংশ জুড়ে নবাব পরিবার থাকায় অনেক সংস্কৃতিই তাদের কাছ থেকে এসেছে। সে সময় ছবি তোলার জন্য মাত্র ২/১ জন আলোকচিত্রী এবং ১/২টি স্টুডিও ছিল ঢাকা শহরে। যা নবাবদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল। নবাবদের ছবি তোলার কাজেই তারা ব্যস্ত থাকতো। নবাব পরিবারের নারীদের কিছু একক ছবি দেখা যায় এসময়। তখন সাধারণ পরিবারের নারীরা স্টুডিওতে যেয়ে ছবি তোলার কথা ভাবতেও পারতো না। পরবর্তীতে বিয়ে দেয়ার প্রয়োজনে নারীদের ছবি তোলা শুরু হলেও বাড়িতে ফটোগ্রাফার ডেকে নিয়ে আসা হতো। আবার নবাবরা তাদের জীবনের অনেক সময় কাটিয়েছেন বিভিন্ন আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে। তার মধ্যে তাদের অন্যতম আনন্দ বিনোদন ছিল শিকার করা। নবাবরা শিকারে যেত ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে। ঢাকার বেশিরভাগ এলাকা তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বাহন হিসেবে ব্যবহার করতেন হাতি। বাঘ হরিণ সহ অন্য অনেক প্রাণীই তারা শিকার করতো।

এরপর তাদের সময়ে ঢাকার মানুষের বিনোদনের জন্য অভিনব বায়োস্কোপ চালু করা হয়। এতে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি আনন্দ লাভ করেছিল। কয়েকটি থিয়েটারও হয় ধীরে ধীরে। যাতে নাটক দেখতে পারে জনগণ। ঢাকার সংস্কৃতিতে নতুন আবিষ্কার হয় কেরোসিনের তৈরি স্টোভ চুলা। এটিও শুরু হয় নবাবি আমলে। যেটি তাদেরকে স্বস্তি এবং আনন্দ দুটোই দিয়েছিল। উৎসব

[১২] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/With_his_family_the_beared_Nabab_on_Eid_day..jpg/220px-With_his_family_the_beared_Nabab_on_Eid_day..jpg

আনন্দের আরেক নাম ছিল পহেলা বৈশাখ, যা তখন খুব আমেজ নিয়ে পালিত হতো। এ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা এখনো বহমান।

সে সময় 'এপ্রিল ফুলে'র প্রচলন শুরু হয় ঢাকা শহরে। ১৯০৮ সালের ১ এপ্রিল ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী হেঁটে হেঁটে পাড়ি দেবে এই কথা শহরে আগের দিন ঢোল পিটিয়ে সকল জনগণকে জানানো হলো, যা দেখতে মানুষজনের উপচে পড়া ভিড় হয়েছিল বুড়িগঙ্গার তীর ধরে। যথাসময়ে এক বুজুর্গ ব্যক্তি এলো এবং খড়ম পায়ে দিয়ে নৌকায় উঠে বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিল। সকল জনগণ একেবারে বোকা হয়ে গেল। সেই থেকে এপ্রিলফুল বোকা বানানো দিবস হয়ে ওঠে ঢাকাবাসীর কাছে।[১৩]

এমনও হাজারো সংস্কৃতিতে ভরপুর ছিল ঢাকা নগরী। আর ঢাকার এই সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা নারী সমাজের ইতিহাস। কালপরিক্রমায় ঢাকার নারীরা বিভিন্ন রকম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে।

সংস্কৃতি ও নারী

সংস্কৃতির রূপ হচ্ছে বহুমাত্রিক। যেমন সৃষ্টিকর্তা নামটি একমাত্রিক হলেও স্থান, শ্রেণি, ধর্ম ও গোষ্ঠীভেদে এর আবির্ভাব বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কোথাও সে নিরাকার আবার কোথাও সে মূর্ত দেবতা। তবে একটি কথা স্পষ্ট যে, সংস্কৃতি গোষ্ঠী, শ্রেণি, রাষ্ট্র, বিশ্ব ইত্যাদি বলয়ের মধ্যে বিবর্তিত হলেও তা সর্বদাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

এই সূত্রে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, নারীর সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক কি? ব্যক্তি হিসেবে নারীরা সংস্কৃতি মনা কিনা? এবং সভ্যতা সৃষ্টিতে নারীর কোনো ভূমিকা ছিল কি-না? যুগে যুগে কালে কালে সংস্কৃতি চর্চা নারীদের দ্বারাই বেশি হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস থেকে নারীরা অনেক ধরনের সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। পালন করেছে বিভিন্ন রীতিনীতি। যেগুলো কালক্রমে পুরুষের চেয়ে নারীদেরকেই প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি।

বিভিন্ন লোককথা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষাও জন্ম দিয়েছে অনেক সংস্কৃতির। যেগুলো নারীরা পালন করেছে পুণ্য ভেবে। নারীদের এই সকল সংস্কৃতিসমূহ পরবর্তীতে সমাজের অন্যান্য মানুষদেরকেও প্রভাবিত করতো। ঢাকা ছিল এমন এক জটিল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বেষ্টিতে নগরী, যেখানে

[১৩] অনুপম হায়াৎ, *নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ডিরেক্টর প্রকাশন, ঢাকা - ২০০১, পৃ. দ্রষ্টব্য : ২, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৮, ৪৮, ৫৮, ৬৯, ৮৮, ৯০, ৯১।

বসবাস ছিল বিভিন্ন জাতি, ধর্মের মানুষ। নারীরাও ধারন করেছিল বিভিন্ন মানুষের থেকে পাওয়া বিভিন্ন রীতিনীতি। এসকল মিশ্র সংস্কৃতি নারীদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীতে যে সংস্কৃতগুলো নারীদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে বিশাল ভূমিকা রাখে। মূলত মানুষ নিজেরা যা, তাই তাদের সংস্কৃতি। নারীরা যে সকল লোকাচার বা প্রথা পালন করতো, তাদের সাথে যা যা হতো সবকিছুই তাদের সংস্কৃতির অংশ। ঢাকার নারীর এই সকল সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য পেতে তৎকালীন সময়ের সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা, যা থেকে তৎকালীন ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবন

নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম বিশ্বাস এবং তার ফলে নারীর জীবনের সার্বিক পরিবর্তন, বিভিন্ন রীতিনীতি পালন, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি নারীর জীবনকে কেমনরূপে গড়ে তুলেছিল এ সব কিছুই তাদের সংস্কৃতির অন্তর্গত। অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, নৃত্যকলা ও সংগীতে তাদের অবদান এবং সমাজে তাদের মোকাবেলা করে টিকে থেকে স্বমহিমায় তাদের কর্মে নিপুণতা প্রদর্শনপূর্বক ঢাকার ইতিহাসে অন্যান্য নারীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকা সত্যি অবিস্মরণীয়।

প্রথমেই যদি সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ক চিন্তা করতে হয় তাহলে দেখা যায় মুসলমান নারীরা অনেক পিছিয়ে ছিল ধর্মীয় বেড়াজালের কারণে। মূলত ধর্মই নারী মুক্তির অন্তরায় ছিল। আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল নারীর প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। তবে এদিক থেকে তৎকালীন সময়ে সমাজে হিন্দু নারীদের অবস্থা তুলনামূলক উন্নত অবস্থায় ছিল। সে সময় অনেক সংস্কারকরাই অবহেলিত হিন্দু নারীদের উন্নয়নে কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), প্রমুখ। কিন্তু অপর পক্ষে মুসলিম নারীর জন্য তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে কাউকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় না। মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হতে নারীর আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা পরিলক্ষিত হয় এবং এসব চিন্তাভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় সমকালীন পত্রপত্রিকায়। সেসকল পত্রিকার মধ্যে *ঢাকা প্রকাশ* ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে।[১৪]

[১৪] W.W.Hornell, Progress of Education in Bengal, 1902-03 to 1906-07, Third Quinquennial Review, Calcutta,1907, p. 128.

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলিম নারীসমাজের নিশ্চলাবস্থার অন্যতম কারণ ছিল অবরোধ প্রথা, যার মূলে ছিল তাদের অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস। ধর্মীয় পরিবেশ নারীর সামাজিক, পারিবারিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো। তৎকালীন বাঙালি মুসলিম নারীরা নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কোনো নারীর সামনেও যেতে পারত না।

আর এই নিয়মগুলো অভিজাত ও রক্ষনণশীল পরিবারে কঠোরভাবে পালিত হতো। মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া এ প্রসঙ্গে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন তার *অবরোধবাসিনী* গ্রন্থে । তার অভিজ্ঞতাই তিনি গ্রন্থে তুলে ধরেছিলেন যার মূল কথা ছিল এমন– যখন মেয়েরা কিছু বুঝতেই শেখেনি তখন থেকেই তাকে পুরুষের সামনে তো বটেই নারীর সামনেও কঠোর পর্দা করতে হতো। পাড়ার কোনো মহিলা অন্দরমহলে ঢুকলে তাকে প্রাণ ভয়ে তাড়াতাড়ি লুকাতে হতো।[১৫] এক কথায় তৎকালে নারীরা অন্তঃপুরের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকতো এবং আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে অনেক কঠোর পর্দা প্রথা মেনে চলতে হতো। সূর্যের আলো থেকেও নারীরা বঞ্চিত ছিল এবং পর্দার অন্তরালে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে নারীরা মৃত্যুবরণও করতো।[১৬] ইসলাম নারীকে বন্দিনী থাকার বিধান না দিলেও প্রচলিত পর্দা প্রথা নারীকে বন্দিনীরূপে রেখেছিল।

স্থানীয় লোকাচার বা রীতিনীতি পালন

ঢাকার নারীরা তৎকালীন সময়ে অনেক ধরনের লোকাচার পালন করতো। পত্রিকার মাধ্যমে সেসব অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা নারীর বিবাহের অনেক স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ প্রথা অর্থাৎ স্বামীর সাথে সহমরণ ইত্যাদি, আর এ সকল বিয়েকে কেন্দ্র করে পালিত হতো নানা ধরনের সংস্কৃতি ও লোকাচার। নারীর সংস্কৃতির অন্যতম একটা অংশ হচ্ছে 'বিবাহ' ব্যবস্থা। ঢাকার মুসলিম নারী সমাজের করুণ পরিস্থিতির জন্য প্রধান কারণ ছিল সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ। সে সময় অনেক অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়া হতো। অল্প বয়সে বিয়ে না হলে সেই মেয়ের জীবন জাহান্নামে রূপান্তরিত হতো। মানুষের কথার আঘাতে সেই মেয়ে নিজে এবং তার পরিবার হতো ক্ষতবিক্ষত। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর বাল্যবিবাহের পক্ষেই ছিল। এমনকি সেই মেয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার বিয়ে হয়ে যেত। কোলে করে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যাওয়া হতো। নারীর সেই বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করে ঢাকার

---

[১৫] এ মালেক, এল, এম, এফ, *অবরোধ প্রথার অপকারিতা*, *মাসিক মোহাম্মদি*, দ্বিতীয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৯ খ্রি.), পৃ. ২৬৯।

[১৬] তপতি বসু, *বাঙালি মেয়েদের লেখাপড়া*, *শারদীয় আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, ২২৮।

মানুষজন পালন করতো অনেক রীতি নীতি। নারী যেহেতু বাল্য বধূ, তাই সে ঋতুমতী হওয়ার আগেই তার বিয়ে হতো। তখন সে থাকতো তার শাশুড়ি বা ননদের সাথে। নিজ হাতেই ছোটবেলা থেকেই গড়ে নিত তারা। অনেক ক্ষেত্রে নারীর ঋতুমতী হওয়ার আগ পর্যন্ত সে থাকতো তার বাবার বাড়ি। সে যেদিন ঋতুমতী হতো সেদিন শ্বশুর বাড়ি এবং বাবার বাড়ি উভয়ের জন্যই ছিল অনেক আনন্দের দিন। তারা এই দিনটাকে উৎসবমুখর হিসেবে রূপান্তরিত করতো। এই উৎসবটি পালিত হতো ঢাকার নারীদের বিভিন্ন সংস্কৃতি পালনের মধ্য দিয়ে। যে বাড়িতে বাল্যবধূ অবস্থান করতো, যেমন বাবার বাড়ি থাকলে শ্বশুর বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার ও নতুন শাড়ি পাঠানো হতো আবার শ্বশুর বাড়িতে থাকলে অনুরূপ বাবার বাড়ি থেকেও ফল, মিষ্টি এবং নতুন শাড়ি পাঠানো হতো। বাল্যবধূ নতুন শাড়ি পড়ে বসে থাকতো এবং তার সামনে রাখা হতো অনেক ধরনের খাবার। লোকজ সংস্কৃতি হিসেবে আটা/মাটির তৈরি দুইটি লিঙ্গের পুতুল রাখা হতো এবং চোখ বন্ধ করে পুতুল উঠাতে বলা হতো। যে লিঙ্গের পুতুলটা সর্বাধিক বার উঠতো ধরে নেওয়া হতো তার অনাগত সন্তান ও সে লিঙ্গের হবে।[১৭]

অর্থাৎ বাল্যবধূ ঋতুমতী হলেই সে সন্তান উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো। মাতৃত্ব হচ্ছে একটি নারীর সবচেয়ে মৌলিক পরিচয়। পৃথিবীতে প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি করে নারী প্রাণ সংরক্ষণও করে। এই সত্য আদিকাল থেকেই সবাই জেনে আসছে। তাই শিল্প ও সংস্কৃতিতে মাতৃ প্রতীকের প্রবল ধারা নন্দিত ও বর্তমান। বাল্যবিবাহ নারীর জীবনে অনেক ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতো, যা তাদেরকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিত। অকাল প্রসূতিজনিত কারণে অসংখ্য কিশোরী মা মৃত্যুমুখে পতিত হতো যা *ঢাকা প্রকাশ* তুলে ধরেছিল।

বাল্যবিবাহের মতোই আরেক ভয়ংকর প্রথা প্রচলিত ছিল সমাজে, সেটা হচ্ছে সতীদাহ প্রথা। স্ত্রীর আগে স্বামীর মৃত্যু হলে সেই নারীকে স্বামীর সাথে চিতায় উঠিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হতো। হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল এই সংস্কৃতি। তাদের মতে স্বামী হচ্ছে দেবতা। আর বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। পৌরাণিক কাহিনি থেকে এই সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়েছিল। যা তৎকালীন ঢাকার নারীদের জীবনে ভয়ংকর ইতিহাস হয়ে রয়েছে। কথিত আছে দক্ষ রাজার কন্যা শিবের স্ত্রী সতী, স্বামীর সাথে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেন। আর তখন থেকেই মূলত হিন্দু ধর্মে এই অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। সতীদাহ হলো হিন্দুধর্মাবলম্বী কোনো বিধবা নারীকে স্বামীর চিতায় সহমরণ বা আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করার এক অমানবিক প্রথা। রাজা রামমোহনের প্রচেষ্টায়

[১৫] শায়লা পারভীন, *উনিশ বিশ শতকে পুরনো ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২৮।

১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রহিত করা হয় এবং পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই অনুমোদিত হলো বিধবা বিবাহ আইন। এ আইনের মাধ্যমে সমাজের হিন্দু নারীদের অমানবিক প্রথা বা সংস্কৃতির বেড়াজাল ভেঙে মুক্তি লাভ হয়েছিল। তৎকালীন ঢাকায় নারীদের বিয়ে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অন্ধবিশ্বাস ও রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। তারা বিশ্বাস করতো যে, মেয়ের শরীরে প্রজাপতি বসলে তার বিয়ে আসন্ন।[১৮] কনের এক গালে কেউ চড় দিলে তার বিয়ে হবে না ইত্যাদি।[১৯] মজার বিষয় হচ্ছে এত রক্ষণশীল পরিবেশে নারীরা থাকলেও তারাই আবার ঘটকালি পেশার সাথে জড়িত ছিল। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়ে দেখে তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করতো। বিনিময়ে দাবি করতো মোটা অঙ্কের অর্থ কড়ি। কোনো পুরুষ ঘটক মেয়েদের দেখতে পারতো না। তখন নারীরা পরিবারের পছন্দেই বিয়ে করতো।[২০] নিজের স্বামীকে বিয়ের আগে দেখার সুযোগ তাদের হতো না। ঢাকার নারীদের বিয়েতে তাদের পরিবার অনেক বেশি খরচ করতো, বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে। স্বর্ণ, আসবাব সহ এমন কোনো জিনিস দিতে কার্পণ্য করতো না তাদের পরিবার। কয়েক বছর পরিধান করার পোশাকও তারা দিয়ে দিত। সে সময় বরপক্ষ কনেকে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কারসহ দামি দামি উপহার দিত। হিন্দু নারীরাও বিয়েতে অনেক টাকা পেত। কনের বাবা পেতো সেই টাকা। পাকিস্তান আমলে এ রীতি ছিল।[২১] সেখানে থাকতো প্রচুর আলোকসজ্জা এবং আতশবাজি ফুটানো হতো। বিয়ের পরে সকল অতিথিদেরকে নবাব পরিবারে মিষ্টি ও রুমাল দেওয়ার রীতি প্রচলনের ইতিহাস পাওয়া যায় এবং তাদের মধ্যে দেনমোহর দিয়ে নারীকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত ছিল। নগদ ১০ হাজার টাকা প্রদান করে অনেকগুলো বিয়ের তথ্য পাওয়া যায় সে সময়। যা অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং সম্মানজনক নারীদের জন্য।[২২] বিয়ের মতো বিবাহবিচ্ছেদও প্রচলিত ছিল সে সময়। নবাবি আমলে নারীদেরকে তালাক দিলে কমপক্ষে তিন মাসের ভরণপোষণ দিয়ে তালাক দেওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়।[২৩] নারীরা বিয়েতে তখন সাজতো সে সময়ের প্রেক্ষাপটে যতটুকু উপকরণ পাওয়া যেত তা দিয়েই। বিয়েতে সাজার রীতি প্রচলিত ছিল সেসময়। মেহেদি, আলতা, কাজল,

---

[১৮] জিনাত আরা সিরাজী,(২০০৪) *ঢাকার শিয়া সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং উর্দু ও ফার্সি সাহিত্যে তাদের অবদান*, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ, ৫৪।

[১৯] সায়েম সোলাইমান (সম্পা.), ২০০৮, *আমার সাত দশক - শিল্পপতি আনোয়ার হোসেনের আত্মজীবনী*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ধানমন্ডি, ঢাকা,পৃ. ৩৯।

[২০] দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ এপ্রিল, ১৯৯৮, সুলতান মাহমুদুর রহমান (সম্পা.), ২০১৩, *জাহানারা খাতুন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, নিমতলি*, ঢাকা, চিত্র নং : ১৮৫-১৮৮।

[21] অনুপম হায়াৎ, *নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ডিরেক্টর প্রকাশন, ঢাকা - ২০০১, পৃ. ৬৭।

[২২] অনুপম হায়াৎ, *নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ডিরেক্টর প্রকাশন, ঢাকা - ২০০১, পৃ. ৯৪।

[২৩] অনুপম হায়াৎ, *নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ডিরেক্টর প্রকাশন, ঢাকা - ২০০১, পৃ. ১৪৯।

সুরমা ইত্যাদি ছিল তাদের প্রসাধনী এবং লিপিস্টিকের বদলে ব্যবহার করতো লাল ট্যাবলেট, যা জিহ্বার সাথে ঘষে ঘষে লাগানো হতো। চুলে খোপা করার রেওয়াজ ও প্রচলিত ছিল। বিয়েতে লাল শাড়িই সাধারণত পড়তো নারীরা।[২৪]

ঢাকার নারীরা বিয়ে সংক্রান্ত অনেকগুলো রীতিনীতি ও সংস্কৃতি পালন করতো। যাকে আঞ্চলিক ভাষায় টোটকা বলে। যেমন: বন্ধাত্ব বরণ না করার জন্য, নারী গর্ভবতী থাকলে, এবং বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে। এ সকল রীতিনীতি নারীরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে মেনে চলতো। এগুলো তাদের উপর বংশপরম্পরায় আরোপিত হয়েছিল। বন্ধ্যাত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে যে সকল কুসংস্কার প্রচলিত ছিল তা হচ্ছে– ঘরের বাইরে কাপড় শুকাতে দিলে তা দিনের বেলাতেই ঘরে না আনলে রাতে অশুভ আত্মা কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়ায় এবং সেই নারী তখন সন্তান ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।[২৫] রাতের বেলা কোনো নারী যদি গাছের পাতা বা ফুল ছিড়ে তাহলে সেই নারীর গর্ভপাত ঘটে ইত্যাদি।[২৬] আবার বন্ধ্যাত্ব ঘোচানোর জন্যও নারীরা বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার বিশ্বাস করে অনেক ধরনের নিয়মকানুন ও প্রথা মেনে চলতো। তার মাঝে অন্যতম একটি হচ্ছে সন্তান দত্তক আনলে খুব দ্রুত গর্ভবতী হয় নারীরা।[২৭] গর্ভে সন্তান থাকাকালীন সময়ে তাদেরকে আরো বেশি কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে দিন কাটাতে হতো। ভরদুপুরবেলা তারা ঘর থেকে বের হতে পারতো না। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল এবং অবশ্যই মাথায় কাপড় দিয়ে বাইরে যেতে হতো।[২৮] নারীরা বাচ্চা হওয়ার সময় অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হতো, তাই তাদেরকে মৃত্যুর আগে পছন্দের খাবার খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত ছিল। সন্তান গর্ভকালীন সপ্তম/অষ্টম/নবম মাসে এই খাবার খাওয়ানো হতো। পরবর্তীতে কালে কালে এটি নারীরা তাদের ঐতিহ্যের অংশ মনে করে পালন করতো।[২৯]

গর্ভবতী নারীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী সময়ে অনেক বেশি প্রথা পালন করতে হতো তাকে। হিন্দু শিশুর জন্মের পর জোকার ধ্বনি দেয়া হতো। পুত্রের জন্য বেজোড় ধ্বনি আর কন্যাসন্তানের জন্য জোড় ধ্বনি দেয়া হতো।[৩০] আর মুসলমানদের মধ্যে ছেলেসন্তান হলে তার কানে আজান দিত এবং কন্যাসন্তানের কানে দাদি নানিরা কালেমা পড়তো।[৩১] শিশুর নাড়ি ফেলা হতো ভালো কোনো স্থানে। যার গুণাবলি শিশুর মধ্যে পরবর্তীতে বিকশিত হবে। যেমন– মসজিদ, স্কুল,

---

[২২] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, করিমুন্নেসা, গৃহিণী, বয়স, ৭০ বছর।

[২৫] মোমেন চৌধুরী, (১৯৯৯), *বাংলাদেশের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, জন্ম ও বিবাহ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৬৮।

[২৬] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, *রুপালী খাতুন,* বয়স, ৭৮ বছর।

[২৭] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, *খদেজা বিবি,* বয়স, ৮৮ বছর।

[২৮] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, *চান বিবি,* বয়স, ৯০ বছর।

[২৯] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, *জমিরন খাতুন, বয়স, ৮৮ বছর ।*

[৩০] মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, জন্ম ও বিবাহ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৬৮ ও ১১৩।

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।[৩২] তবে কন্যাসন্তানের নাড়ি ফেলতো তারা কলা গাছের নিচে। কারণ কন্যাদের কাছে তাদের একমাত্র আশা ছিল তারা যেন শান্ত ও নরম স্বভাবের হয়। অন্য কোনো স্বপ্ন কন্যাসন্তান নিয়ে দেখা হতো না– এ থেকে সহজেই ধারণা করা যায়।[৩৩] সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চুলের ওজনের সমান স্বর্ণ/রুপা দেওয়া প্রচলিত ছিল সেসময় এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তারা সন্তানের মুখে মধু দিত।[৩৪] বাচ্চাদের জন্য তারা নিজ হাতে কাজল বানাতো এবং তাদের কপালে টিপ দিত, যাতে বদ নজর না লাগে। তারা বিশ্বাস করতো একটি সাধারণ টিপ বাচ্চাকে খারাপ নজর থেকে বাচাতে পারবে। এটি তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতারই পরিচয় প্রকাশ করে। কুয়ায় পড়ে বাচ্চারা যাতে মৃত্যুবরণ না করে সেজন্য কুয়াপাক লোকাচার পালন করতো ঢাকার নারীরা।[৩৫]

ঢাকার নারীদের বিশেষ করে নবাবি আমলে ছটি ওঠার পরে তাদের স্বামীরা বিশাল পার্টি দিত। যেখানে ভালো খাবারের পাশাপাশি আনন্দ আয়োজন হিসেবে বাদ্য পরিবেশন ও লায়ন থিয়েটার মঞ্চস্থ হয়।[৩৬] ১৯০৪ সালে নবাব পরিবারের শুধু মহিলাদের জন্য পিকনিকের তথ্য পাওয়া যায়। যেখানে কোনো পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল।[৩৭]

শিক্ষাদীক্ষা, গান, নাচ এবং অভিনয়ে ঢাকার নারী

ঢাকার নারী সংস্কৃতির অন্যতম একটি উপাদান হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার অনগ্রসরতা প্রাচীনকাল থেকে নারীকে অচল এবং পঙ্গু করে রেখেছিল– দিয়েছিল তাদেরকে দাসত্ব। তেমনিভাবে শিক্ষার আলো তাদেরকে মুক্তির পথ দেখায়। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাজীবনের শুরু হয়। ধীরে ধীরে ঢাকার অন্তঃপুরের নারীদের পড়ালেখার ব্যবস্থা হয়। সেসময় নারীরা গৃহেই পড়ালেখা করতো এবং বাইরে থেকে পরীক্ষকরা প্রশ্ন তৈরি করে পাঠাতো এবং অভিভাবক পাশে বসে অঙ্গীকারনামা দিত যে, সে দেখে লেখেনি।[৩৮] এভাবে তাঁর পরীক্ষা সমাপ্ত হতো এবং রেজাল্ট ভালো হলে পুরস্কার দেওয়া হতো।

---

[৩১] বাক্তিগত সাক্ষাৎকার, ছকিনা বিবি, বয়স, ৮২ বছর।

[৩২] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, *খদেজা বিবি,* বয়স, ৮৮ বছর।

[৩৩] শায়লা পারভিন, *উনিশ বিশ শতকে পুরনো ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৫১।

[৩৪] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, করিমন নেচ্ছা, বয়স, ৯০।

[৩৫] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, জমিলা খাতুন, বয়স, ৮৮।

[৩৬] অনুপম হায়াৎ, *নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ডিরেক্টর প্রকাশন, ঢাকা - ২০০১, পৃ. ১১৫।

[৩৭] অনুপম হায়াৎ, *নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ডিরেক্টর প্রকাশন, ঢাকা - ২০০১, পৃ. ২।

[৩৮] মুনতাসির মামুন, *ঢাকা সমগ্র-৫*, পৃ. ১৭৬।

গৃহে নারী শিক্ষক গিয়ে মেয়েদেরকে পড়াতেন। তবে নবাবি আমলে ঢাকার মেয়েদেরকে পড়ানোর জন্য পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। এ সময় পূর্বের বেড়াজাল অনেকটাই ভেঙে যায়।[৩৯]

নবাব পরিবারের প্রথম নারী যিনি স্নাতক পাশ করেন তিনি হলেন নবাব আহসান উল্লাহর কন্যা পরীবানুর মেয়ে জোলেখা বানু। ১৯২৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেন।

[৪০]

ছবি : নওয়াব আহ্সানউল্লাহ্ দৌহিত্রী জুলেখা বানু
মাসিক *সওগাতে* (১৯১৮ খ্রি.) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী

সমাবর্তনের গাউন জড়িয়ে হাতে সার্টিফিকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করা জুলেখা বানু (১৯০৪ - ১৯৭৪)। তিনি ছিলেন পরীবানুর মেয়ে এবং নবাব আহ্সানউল্লাহর নাতনি। পরনে শাড়ি, হাতে ঘড়ি, গলায় হার এবং কানের দুল তার রুচি ও আভিজাত্যের প্রমাণ বহন করছে। পায়ে ছিল শু জুতা। এ থেকে সেসময়ের নারীদের পোশাক এবং সাজসজ্জা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

পত্রিকার একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে মুসলিম বাংলার উচ্চশিক্ষিত ফজিলাতুন্নেছার এমএ পরীক্ষা দেয়ার খবরও। করোটিয়ার মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এবং পরে বিলেত থেকে ডিগ্রি নেন।[৪১] ফজিলাতুন্নেছা **মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা** শিরোনামে সমসাময়িক

---

[৩৯] অনুপম হায়াৎ, *নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ডিরেক্টর প্রকাশন, ঢাকা - ২০০১, পৃ. ১।

[৪০] https://www.tbsnews.net/bangla/sites/default/files/styles/infograph/public/images/2024/01/15/julekha_banu_1927.jpg

[৪১] অনুপম হায়াৎ, *নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ডিরেক্টর প্রকাশন, ঢাকা - ২০০১, পৃ. ১৪৮।

সওগাত পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। যেখানে তিনি তরুণ সমাজকে নারীশিক্ষার অভাব দূর করার জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানান।[৪২] তবে উল্লেখ্য প্রথম বাঙালি ছাত্রী হিসেবে এম এ পাসের সম্মান লাভ করেছিলেন চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৪ সালে।[৪৩] চন্দ্রমুখি বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমএ পাশ নারী এবং তিনিই প্রথম যিনি ইংরেজিতে অনার্স সহ এমএ পাশ করেছিলেন। বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবেও দায়িত্বরত ছিলেন তিনি। বাংলার নারী শিক্ষার ইতিহাসে তার প্রচেষ্টা ছিল একটি মাইলফলক। অনেক বাধা অতিক্রম করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন কাদম্বিনী বসু।[৪৪] তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা ১৮৬৪ সালে বাংলাবাজার গার্লস স্কুলকেই ঢাকার একমাত্র 'যুবতি' বিদ্যালয় হিসেবে উল্লেখ করে। সম্ভবত এখানে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে 'যুবতি' বিদ্যালয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৪৫] সরকারি বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু করে ইডেন বালিকা বিদ্যালয় যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ সালে।[৪৬] জানা যায় ১৮৮৩ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মেয়ে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী থেকে শিক্ষা লাভ করে।[৪৭] তবে *ঢাকা প্রকাশ* থেকে জানা যায় যে, এত সংস্থা কর্তৃক নারী শিক্ষার প্রসারের বহুকাল পূর্ব থেকেই পূর্ববঙ্গে অন্তপুর শিক্ষা চালু ছিল।[৪৮]

তৎকালীন সময়ে মুসলমান নারীর জন্য শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়া মোটেও কোনো সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। কারণ একজন মুসলিম নারীর শিক্ষাজীবন শুরু হতো আরবি বর্ণমালার পরিচিতি ও কোরআন পাঠের মধ্য দিয়ে। তার সাথে গার্হস্থ্যবিদ্যাও শিক্ষা দেয়া হতো নারীকে। মাঝে মাঝে মক্তবে গিয়ে কোরআন শেখার সুযোগ পেত। সম্ভ্রান্ত পরিবারে নারী ওস্তাদের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে কোরআন শিখতো তারা। তবে অনেকে উর্দু বা ফারসি ভাষাও শিখতো। আবার অনেক নারীকে হিসাবরক্ষণ থেকে শুরু করে ঘোড়ায় চড়াও শেখানো হতো। যেমন পরি বিবি (নবাব আহসানউল্লাহর কন্যা) এ সকল বিষয়ে অনেক বেশি পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। সে সময়

---

[৪২] ফজিলাতুন্নেছা, মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সওগাত, জেনানা মহফিল, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রি.), পৃ. ৫২৭

[৪৩] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪৫

[৪৪] Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939*, lieden: E. J. Brill, 1996, pp. 151-152

[৪৫] এই সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে দেখুন, মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সভা সমিতি*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪,পৃ:৪০-৪৩

[৪৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ মাঘ, ১২৭১ (১১ নভেম্বর ১৮৬৪),উদ্ধৃত : *মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র (১৮৪৭-১৯০৫), চতুর্থ খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯১,পৃ. ২৯৫

[৪৭] Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939*, lieden: E. J. Brill, 1996, pp. 136-37

[৪৮] Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal* (1884-1912), Dacca, (Published by the Author), 1974, p. 248

নারীদেরকে আদর্শ স্ত্রী ও মা হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল মুসলমানদের অন্যতম লক্ষ্য।[৪৯] তবে শিক্ষার আলো পরবর্তীতে মুসলমান নারীদের জীবনেও পৌঁছায়। তারাও শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভূমিকা পালন করে গৌরবজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

শিক্ষার পরিমণ্ডল পেরিয়ে ঢাকার নারীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ততা এবং সফলতার চিহ্ন রাখতে শুরু করেন। তবে নারীদের সংগীত চর্চার ইতিহাস অনেক পুরানো। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকেই ঢাকার নারীদের সংগীত চর্চার ইতিহাস পাওয়া যায়। এর পূর্বের ইতিহাস আসলে তেমনভাবে পাওয়া না গেলেও ঢাকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকে। জাহাঙ্গীরের সেনাপতি ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করলে ঢাকার পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে যায়। আর এ পরিবর্তনের অনুষঙ্গ ছিল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিকাশ। লোকমুখে শোনা যায়, শায়েস্তা খানের দরবার কাঞ্চনী (১২০০ নর্তকি ও সেবিকা) দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মূলত যারা নাচ, গানে অনেক বেশি পারদর্শী ছিল, তারাই কাঞ্চনী নামে অভিহিত হতেন। শায়েস্তা খান গান বাজনা এতই পছন্দ করতেন যে সেসময় ঢাকা নগরী সংগীত চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায় এবং নারীরা ছিল এর মূল আকর্ষণ। বিপুল অঙ্কের টাকা এই কাঞ্চনীদের পেছনে খরচ করা হতো। দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীরের কানে পৌঁছে গিয়েছিল এই নারী শিল্পীদের কথা। ঢাকার সেরা গায়ক গায়িকাদের তিনি পরবর্তীতে দিল্লীর দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৫০]

১৯ শতকের ৭০'র দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম সংগীত বিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা সংগীত বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। নিজ গুণে ও গৌরবে বিভিন্ন শ্রেণির নারীরা এতে সংযুক্ত হতে থাকেন। বেগম ফয়জুন্নেছা ১৮৭৬ সালে সংগীত লহরী নামে একটি সংগীত গ্রন্থ রচনা করেন। পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত দুটি প্রতিষ্ঠান ঢাকার সংগীত জগৎকে সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত অলংকৃত করে রেখেছে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম হলো ছায়ানট ও বুলবুল ললিতকলা একাডেমি। গানের পাশাপাশি ঢাকার নারীরা নাচেও ভূমিকা রাখতে শুরু করে। কামরুন্নেসা স্কুলের ভেতর আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ১৯৫০ সালে মেয়েদের নাচ গানের স্কুল খুলেন, যার নাম দেয়া হয় *সুরবিতান*।

---

[৪৯] রওশন আরা বেগম, *নওয়াব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬।

[৫০] দ্রষ্টব্য: মহসিনা আক্তার খানম কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ, '*পরিবেশনা শিল্পে নারী: সংগীত*', যা সোনিয়া নিশাত আমিনের *ঢাকার নগর জীবনে নারী* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, পৃ. ২৫০।

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী

ঢাকার বাঙালি মুসলিম নারীর শিক্ষা সংস্কৃতিতে আনোয়ারা বাহার চৌধুরী অনন্য ভূমিকা রাখেন। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ এবং লেখক। অসম্ভম মেধাবী ছাত্রী পারিবারিক রক্ষনশীলতার মধ্যেও সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। সংগীত ও নৃত্যে অনুরাগের ফলস্বরূপ তিনি ১৯৪১ সালে সুরবিতান নামে নাচ গানের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাধারে বুলবুল ললিতকলা ও বাংলা একাডেমির সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের নিদর্শনস্বরূপ ১৯৬১ সালে ঢাকার শান্তিনগরে হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

[৫১]

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ – ২৭ অক্টোবর, ১৯৪৭)

ঢাকার সংগীত জগতে আরেকজন নারীর নাম উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে তিনি হলেন লায়লা আরজুমান্দ বানু। তিনি ১৯৩৮ সালে রেডিও তে গান গেয়ে উদ্বোধন করেন। দেশ-বিদেশে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

[৫১] https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGupt3THqEJYbSiS9vWoiBorz0XsDcKPT0bA&s

[৫২]

লায়লা আর্জুমান্দ বানু : ঢাকা বেতারের প্রথম মুসলিম গায়িকা
(৫ জানুয়ারি ১৯২৯ – ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫)

লায়লা আরজুমান্দ বানু

লায়লা আরজুমান্দ বানু ১৯৪৪ সালে ইডেন কলেজ থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯৪৬ সালে আইএ পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ সালে বিএ এবং ১৯৫০ সালে এমএ পাশ করেন। তিনি যেমন উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন তেমনি সংগীতেও অনেক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তৎকালীন ঢাকার নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে তিনি আজও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

ঢাকার নাচ গানের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে মুঘলদের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। মুঘলরা ঢাকায় বাউজি প্রথা তৈরি করে গেলেও ব্রিটিশ আমলেও তা বজায় থাকে। তবে সে সময় অনেক সাধারণ নারীদেরকেও সংগীত চর্চা করতে দেখা যায়। অনেক নারীরা পাকিস্তান আমলে সংগীতকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। তারা গায়িকা থেকে শিল্পী নামে সম্মানিত হতে শুরু করে এ সময় থেকে, যা পূর্বে ছিল না।[৫৩] পূর্বে সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা নাচ গানের সাথে নিজেদের জড়াতেন না। ব্রিটিশ আমল থেকে একটু একটু করে পরিবর্তন দেখা যায়, যা পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে আরও ব্যাপকতা লাভ করেছিল।

[৫২] https://i0.wp.com/bmdb.co/wp-content/uploads/2023/02/laila_arjumand_banu_bmdb_ image.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1

[৫৩] সৈয়দ মোর্তজা আলী, *ঢাকায় নাট্য আন্দোলন*, পৃ. ৩৯।

শুধু সংগীতই নয়, ঢাকার নারীরা নাচেও অনেক দক্ষতা প্রদর্শন করেন। বাইজি প্রথা থেকে পরবর্তীতে নারীদের মাঝে নাচের উদ্ভব হয় বলে ধারণা করা হয়। ঢাকা শহরে মুগলরা যে বাইজি প্রথা সৃষ্টি করে গিয়েছিল তাদের কিছু ছিল মাসিক বেতন ভিত্তিতে নিয়োজিত এবং কিছু কিছু বাইজি সাময়িক চুক্তিতে কাজ করতো। মুঘলদের সৃষ্ট বাইজি প্রথা পরবর্তীতে ব্রিটিশরা বাতিল করতে পারেনি।[৫৪] বহু বছর টিকেছিল এই প্রথা। সংগীত এবং নৃত্যের মাধ্যমে নারীরা সেই সময়েও অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয়েছিল এ থেকে তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়। বাইজিরা (গান ও নাচের সংমিশ্রণ) নাচ, গানকে তাদের পেশা হিসেবে নিয়েছিল, যার অনেক সমাদর ছিল সেসময়।

তৎকালীন সময়ে ঢাকার নামকরা বাইজিদের মধ্যে আন্নু, গান্নু ও নওয়াবিন ছিল উল্লেখযোগ্য। যারা নিয়মিত বেতনভুক্ত বাইজি ছিল। ঢাকার আরও কয়েকজন নামকরা বাইজিরা হলেন, অয়ামু বাই, আচ্ছি বাঈ, পান্না বাইজি, রাজলক্ষ্মী বাইজি, ইমামী বাইজি, হরিমতি বাইজি, জানকী বাঈ, মালকা জান, গহর জান, দেবী বাইজি। এ সকল বাইজিদের কথা সমসাময়িক পত্রপত্রিকায়ও উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়। সবার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া গেলেও কারও কারও তথ্য পাওয়া যায়। তাদের সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

জানকি বাঈ

জানকী বাঈ 'ছাপ্পান ছুরি' নামে পরিচিত ছিলেন। ঢাকার এক নবাব (নাম জানা যায়নি) তার মোহে অন্ধ ছিলেন বলে জানা যায়। তাকে হারানোর ভয়ে, ৫৬টি বেত্রাঘাত করে তার শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে কদাকার শরীরে সে অন্য কারও না হতে পারে। সেই থেকে তার নাম হয়েছিল 'ছাপ্পান ছুরি'। তিনি এতটাই সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন যে, ঢাকায় সেই আমলে দেড় হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিতেন।

গহর জান

ঢাকার বাইজিদের মধ্যে অন্যতম আরেক শিল্পী, যিনি ৪০টি ভাষায় গান গাওয়ার মতো পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

---

[৫৪] দ্রষ্টব্য: মহসিনা আক্তার খানম কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ, '*পরিবেশনা শিল্পে নারী: সংগীত*', যা সোনিয়া নিশাত আমিনের *ঢাকা নগর জীবনে নারী* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, পৃ. ২৫৯।

[৫৫]

ছবি : নওয়াবিন বাই

নওয়াবিন বাই

নওয়াবিন বাই সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তার এই ছবি থেকে তার পোশাক, হাত, পা, গলার অলংকার, চুল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

[৫৬]

ছবি : পান্না বাই

[৫৫] https://www.tbsnews.net/bangla/sites/default/files/styles/infograph/public/images/2025/02/01/02.jpg

[৫৬] https://www.tbsnews.net/bangla/sites/default/files/styles/infograph/public/images /2025/02/01/03.jpg

পান্না বাই

তৎকালীন ঢাকার একজন নামকরা বাইজি ছিলেন পান্না বাইজি। তার মায়ের নাম ছিল হীরা বাইজি। নাচ, গানের সুখ্যাতির জন্য তার নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল চারদিকে। সাধারণত বাইজিদের মেয়েরাও এই পেশাই গ্রহণ করতো। তবে অন্য কোনো বাইজির মায়ের নাম জানা যায় না পান্না বাইজির মতো। তবে *ঢাকা প্রকাশ* থেকে জানা যায়, বেশ্যা করার অভিপ্রায়ে কন্যা ক্রয় বিক্রয় হতো সেসময়।[৫৭] কারণ ঘর সংসারহীন প্রতিটি পতিতা মেয়েই চাইতো বৃদ্ধকালের অবলম্বন হিসেবে তার একটি কন্যা সন্তান থাকুক। যার থাকত না তারা কন্যা সংগ্রহ করতো এবং তারাও পরবর্তীতে এই পেশা গ্রহণ করতো।

[৫৮]

আচ্ছি বাই

আচ্ছি বাই

নবাব আবদুল গনির আমলে আচ্ছি বাই ঢাকাতে এসেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নামকরা একজন বাইজি ছিলেন। জানা যায় তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে ঢাকা এসেছিলেন।

---

[৫৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬।

[৫৮] https://www.tbsnews.net/bangla/sites/default/files/styles/infograph/public/images/2025/02/01/04.jpg

রাজলক্ষ্মী বাইজি

রাজলক্ষ্মী বাইজিও আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। জিন্দাবাহার গলির মোড়ে অবস্থিত কালী মন্দিরটি তিনি পুনঃনির্মাণ করেন।[৫৯]

দেবী বাইজি

দেবী বাইজি ছিল ২০ শতকের প্রথম দিকে ঢাকার অন্যতম একজন বাইজি। যিনি ১৯২৮ সালে ঢাকা থেকে নির্মিত প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র 'দি লাস্ট কিস' এ অভিনয় করেন।[৬০] এটি মুক্তি পায় ১৯৩১ সালে। এতে নায়কের ভূমিকায় ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা আজমল অভিনয় করলেও নায়িকা হিসেবে কোনো সাধারণ ঘরের মেয়ে অভিনয় করেনি। ললিতা নামে এক যৌনকর্মী এতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

[৬১]

ললিতা
(ঢাকা থেকে নির্মিত প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্রের নায়িকা, যিনি পেশায় একজন যৌনকর্মী ছিলেন)

তৎকালীন সময়ের ঢাকার পত্রপত্রিকায় এসব বাইজিদের কথা উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা ও এর ব্যতিক্রম নয়, বরং *ঢাকা প্রকাশ* থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সেসময় ঢাকা শহরের একতলা দোতলা বাড়িগুলো বাইজি দ্বারা ভরে গিয়েছিল বলে পত্রিকাটি মত প্রকাশ করে। আরও অনেক ধরনের সংবাদ তাদের নিয়ে প্রকাশ হতো। উদাহরণস্বরূপ একটি সংবাদের চিত্র সংযোজন করা হলো–

---

[৫৯] সোনিয়া নিশাত আমিন, *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৫১-২৫২।

[৬০] শিশির কুমার বসাক, *ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস*, *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা (১৭.১০.১৯৬৪) উদ্বৃত্ত : সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্য চর্চা ও নাটকের ধারা*, পৃ. ৮।

[৬১] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/The_Last_Kiss.jpg/220px-

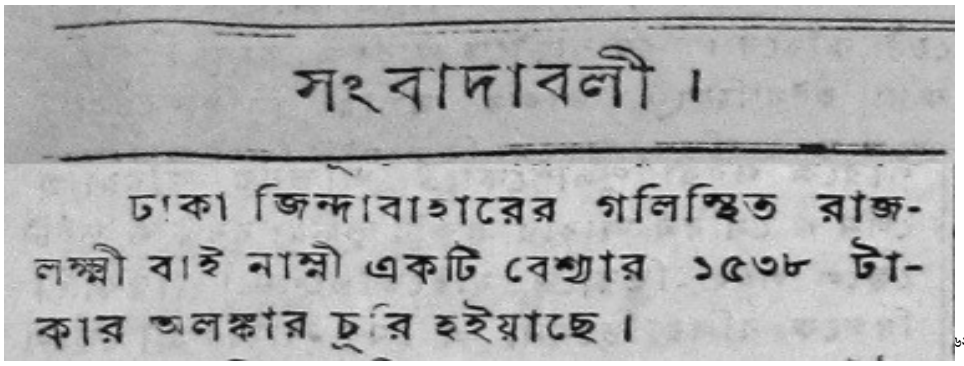
সংবাদাবলী।

ঢাকা জিন্দাবাহারের গলিস্থিত রাজ-
লক্ষ্মী বাই নাম্নী একটি বেশ্যার ১৫৩৮ টা-
কার অলঙ্কার চুরি হইয়াছে।

[৬২]

চিত্রে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় পতিতাদের নিয়ে প্রকাশিত একটি খবর

বাইজিদের প্রাপ্ত এসকল ছবি থেকে তখন ঢাকার বাইজি নারীদের সাজ, পোশাক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তারা শাড়ি, চুড়ির পাশাপাশি নানা ধরনের ভারি গহনা পরতো এবং অনেক সেজেগুজে থাকতো।

তবে পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাইজি প্রথা হ্রাস পেতে পেতে একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই প্রথা স্থায়ী ছিল। *ঢাকা প্রকাশ* থেকে ঢাকার নারীদের আরেকটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক বিষয় খেমটা নাচ সম্পর্কে জানা যায়– কবুতরের মতো জোড়া বেধে নারীরা নাচতো। *ঢাকা প্রকাশ* এই নাচের সমালোচনা প্রকাশ করেছিল। সেসময় বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষিত মানুষও এই খেমটা নাচের আসর বসাতেন, যার একদম বিপক্ষে মত প্রকাশ করে পত্রিকাটি।[৬৩]

'ঢাকার নারীদেরকে নাচ গানের পাশাপাশি নাটকেও অভিনয় শুরু করতে দেখা যায়। ১৮৬১ সালে সর্বপ্রথম ঢাকার মঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকটি মঞ্চায়িত হয়। যা তৎকালীন সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উর্দু ভাষায় মঞ্চায়িত হতো সে সময়ের নাটকগুলো। ঢাকার সুন্দরী গণিকাগণ ওইসব নাটকে স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। আবার অনেক সময় সেসব গণিকারা দরকার হলে পুরুষের ভূমিকায়ও অভিনয় করতেন।[৬৪] ঢাকায় ১৮৯০ সালের দিকে ক্রাউন থিয়েটার নামে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হলে সেখানে অভাবনীয়ভাবে এলাকার স্থানীয় নারী এবং মহিলারা নাটক মঞ্চস্থ করার মতো সাহস দেখান।[৬৫]

The_Last_Kiss.jpg

[৬২] https://www.tbsnews.net/bangla/sites/default/files/styles/infograph/public/images/2025/02/01/09.jpg

[৬৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ আগস্ট, ১৮৬৬।

[৬৪] সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *ঢাকায় নাট্য আন্দোলন*, পৃ. ৪০|

[৬৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৯৩, উদ্ধৃত: মুনতাসির মামুন, ঢাকায় নাট্য আন্দোলন , পৃ. ৪৫।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের পূর্ণচন্দ্র নাটকের মাধ্যমে নারীরা প্রকাশ্য নাটকে আসেন। এই নাটকের নায়িকার নাম ছিল দুনিয়া। দুনিয়া ছিলেন একজন বারবনিতা।[৬৬] এই নাটকের নায়ক যিনি হয়েছিলেন তার নাম ললিতচন্দ্র দাস।[৬৭] কিছু মানুষ আছে যারা বারবনিতাদের অভিনয়ও দেখতে চায় না, আবার ভদ্র মেয়েরা অভিনয় করবে সেটাও মেনে নেয় না, কিন্তু তারা আবার খেমটাওয়ালির নাচও দেখতেন। তাই *ঢাকা প্রকাশ* এই বিষয়ে বারবনিতাদের অভিনয়ের পক্ষেই মত প্রকাশ করে এবং যারা সমালোচনা করতো পত্রিকাটি তাদেরকে কটাক্ষ করেছিলেন। বারবনিতাদের মধ্যে জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিল সরোজিনী ও সরলা। ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৯ সালে ঢাকায় আসলে হৈচৈ শুরু হয়। কারণ অভিনেত্রীরা ছিল বারাঙ্গনা। এ নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধিতার সমালোচনা করে *ঢাকা প্রকাশ* এ মন্তব্য করা হয়েছিল।[৬৮] থিয়েটার চর্চা বিকাশ লাভ করায় মুম্বাই, দিল্লি ও কলকাতার পেশাদার নাট্যদলগুলো ঢাকায় এসে নাটক মঞ্চায়ন করতে থাকে। নারী জাগরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তৎকালীন নাটক থেকে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৯৫১ সালে 'দুই পুরুষ' নাটকটি রূপমহল সিনেমা হলে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে মহিলারাই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেন।[৬৯]

যুগ যুগ ধরে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা শাখায় নারীর পদচারণা থাকলেও তা ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিত হয়েছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সমাজের চোখে তারা সমাদৃত না হলেও ঢাকার শুরু থেকে সাহিত্য রচনায় পর্দার অন্তরালে থেকেই অবদান রেখে গেছেন। মহিলা সাহিত্যিকদের দ্বারা ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ *রূপজালাল*। এটি ১৮৭৬ সালে নওয়াব ফয়জুন্নেসা রচনা করেন। ঢাকার গিরিশ চন্দ্র প্রেস থেকে এটি প্রকাশিত।[৭০] উল্লেখ্য নারীর সাহিত্যচর্চা ও সৃজনশীলতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ঢাকায় প্রকাশিত *সওগাত* পত্রিকা। ছবিসহ মহিলা সাহিত্যিকদের লেখাগুলো *সওগাত* পত্রিকা প্রকাশ করে ১৯৩০ সালে। মূলত কলকাতায় নারীদের সাহিত্য প্রতিভা শুরু হলেও নারীর সাহিত্য জগৎ ঢাকাতেই তার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ এর ফলে সমাজে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সূচিত হয়, আর এই পরিবর্তন শুধু সমাজে নয় নারীর জগতেও দেখা যায়।

---

[৬৬] সত্যেন সেন, *শহরের ইতিকথা*, পৃ. ১০।

[৬৭] সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *ঢাকায় নাট্য আন্দোলন*, পৃ. ৪০ (তিনি এই গ্রন্থের পৃ. ৩৯ এ বলেন, ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্রাউন থিয়েটারে 'পূর্ণচন্দ্র' অভিনীত হয়।

[৬৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ আগস্ট, ১৮৮৯।

[৬৯] সৈয়দ জামিল আহমেদ, *নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলব'*, পৃ. ৬৮।

[৭০] সোনিয়া নিশাত আমিন, *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৬৯।

পরিশেষে বলা যায় যে, *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। অন্তঃপুর শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় কিভাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন বিভিন্ন সময় তা উঠে এসেছে পত্রিকার পাতায়। শিক্ষার আলো যখন নারীদের জীবনে প্রবেশ করেনি তখন তারা অনেক ধরনের স্থানীয় লোকাচার পালন করতেন যা নিয়ন্ত্রিত হতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষার দ্বারা এবং সেসব সংস্কৃতি থেকে বের হতে নারীদের অনেক সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। নারীরা পরবর্তীতে শিক্ষার পাশাপাশি অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন- নাচ, গান, নাট্যচর্চা, সাহিত্যচর্চায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে শুরু করায় ধীরে ধীরে নারীদের মধ্যে নবজাগরণ শুরু হয়। সাংস্কৃতিক এই জাগরণের ছোয়ায় বদলে যায় নারীর ফেলে আসা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন।

চতুর্থ অধ্যায়

নারী বিষয়ক খবরের ধরন, বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র্য

সমাজের দর্পণ হিসেবে পরিচিত হচ্ছে সংবাদপত্র। এতে নানা ধরনের ঘটনার প্রতিফলন ঘটে। মূলত সংবাদ নির্ভর প্রকাশনাগুলোকে সংবাদপত্র বলা হয়ে থাকে।[১] ঢাকার বিগত ৪০০ বছরের ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা যায় সংবাদপত্রের বয়স প্রায় ১০০ বছর বা তার অধিক। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা হচ্ছে *ঢাকা নিউজ* যা ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৬০ সালে মাসিক পত্রিকা *কবিতা কুসুমাবলি* প্রকাশিত হয়। আর আমার আলোচ্য *ঢাকা প্রকাশ* প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি সকল ধরনের খবরই প্রকাশিত হয় এতে এবং নারী বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে পত্রিকার পাতায় পাতায়।

সংবাদপত্রের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বলা যায় ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত *সম্বাদ ভাস্কর* পত্রিকায় নারী বিষয়ক নানাবিধ সামাজিক সমস্যা, যেমন- সহমরণ, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রীজাতির সামাজিক অধিকার, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে সরব হয়।

তবে বাংলা সংবাদপত্রের জগতে একটানা ষাট বছর ধরে প্রকাশিত হয় *বামাবোধিনী* পত্রিকা (১৮৬৩-১৯২৩ খ্রি. পর্যন্ত)। এতে নারীরা প্রথম রচনা প্রয়াসের সুযোগ পায়। তবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় শুধু নারী বিষয়ক খবর না প্রকাশ করলেও এতে তৎকালীন সমাজের নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ই ফুটে ওঠে। যা থেকে সমকালীন নারীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

পত্রপত্রিকায় মূলত ঢাকার নারীর সম্পৃক্ততা ঘটে তিন ভাবে। যেমন- অংশগ্রহণকারী কর্মী অথবা লেখক হিসেবে, পাঠিকা হিসেবে এবং উপস্থাপিত বিষয় হিসেবে।[২] ১৮৫৬ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত (১৯০৫) ব্রিটিশ আমলে কোনো নারী সাংবাদিকের নাম পাওয়া যায় না। ঢাকার সংবাদপত্রের ইতিহাসে *ভারত মহিলা* নামক মাসিক পত্রিকাটি সর্বপ্রথম নারী সম্পাদিত পত্রিকা। এটি সম্পাদনা করতেন ব্রাহ্মণ মহিলা সরযুবালা দত্ত। এই পত্রিকাটি নারীসমাজের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কারণ এই পত্রিকায় নারীদের সমসাময়িক সমস্যাবলি স্থান পেয়েছিল।[৩]

---

১ *বাংলাদেশের সংবাদপত্রে নারী বিষয়ক খবর প্রকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২০।

২ অনুপম হায়াত, *গণমাধ্যম ও নারী*, সমাচার প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১১।

৩ গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ : *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস*, নিরীক্ষা, জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৫।

১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তানের বিভক্তি হলে ঢাকা হয় নতুন পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের রাজধানী। এই সময় নতুনরূপে নারী সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ১৯৪৯ সালের সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মহিলা সাপ্তাহিক *সুলতানা* প্রকাশিত হয়।[৪] ঢাকা থেকে সচিত্র সাপ্তাহিক *বেগম* প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। প্রথমে সুফিয়া কামাল সাংবাদিক থাকলেও পরে নুরজাহান বেগমের সম্পাদনায় এটি দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়।[৫] বাংলাদেশ সহ সমগ্র উপমহাদেশে নারী সাংবাদিকতার পথিকৃত ছিলেন নুরজাহান বেগম। *বঙ্গমহিলা* ছিল প্রথম নারী সম্পাদিত বাংলা ভাষার পত্রিকা আর *বেগম* ছিল প্রথম সচিত্র নারী সাপ্তাহিক পত্রিকা, যা এই উপমহাদেশে প্রথম সূচনা করে। যে সময় নারীদের ছবি তোলা এত সহজলভ্য ছিল না, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কঠিন সময়ে নারী ছবি সংবলিত পত্রিকা প্রকাশ করা ছিল সাহসিকতার পরিচয়স্বরূপ এবং এই পত্রিকাটি পরিণত হয়েছিল নারীর একান্ত কণ্ঠস্বর হিসেবে। *বেগম* পত্রিকা নারীদের কাছে একটি ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছিল, যেখানে তাদের ভাবনা-চিন্তা, সৃজনশীলতা, নারী জাগরণ, নারী স্বাধীনতা থেকে শুরু করে নারী অধিকার সকল কিছুই উঠে এসেছে। নারীরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাদের নানা সমস্যা, জন্মনিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে লিখতো। *বেগম* পত্রিকা থেকে জানা যায় নারীরা তখন অংশগ্রহণকারী কর্মী ও লেখক হিসেবে অনেক ভূমিকা পালন করে।[৬]

আর সংবাদপত্রের পাঠিকা নিয়ে কোনো জরিপ না হওয়ায় এর সঠিক হিসাব জানা না গেলেও বর্তমান সময়ে যে ঢাকার নারীরা পত্রপত্রিকার নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে সেটি বলাই যায়। কারণ নারীদের পছন্দের পত্রিকাটিই বর্তমানে বেশিরভাগ সময় রাখা হয়। তবে পূর্বে চিত্রটি এমন ছিল না। একটা সময় ছিল শুধু সাপ্তাহিক *বেগম* ই ছিল নারীদের একমাত্র ভরসার পত্রিকা।[৭] পত্রিকার চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করলে তাদের পাঠিকা হিসেবে ভূমিকাটা অনুমান করা যায়। তবে *ঢাকা প্রকাশে* নারীদের কোনো চিঠি আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

সবশেষে পত্রিকায় উপস্থাপিত বিষয় হিসেবে নারীদের একেবারে অধস্তন রূপটি দেখানো হয়। কারণ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ভেতর দিয়েই সংবাদপত্র কাজ করে। ঢাকার সংবাদপত্রের ইতিহাস এবং *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার সকল সংখ্যা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্রবন্ধ, সংবাদ, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র এবং বিজ্ঞাপন পর্যালোচনা করলে এগুলোর সর্বত্রই পুরুষের আধিপত্য দেখা যায়। এর ফলে সংবাদ হওয়ার ক্ষেত্রেও নারীরা হচ্ছে বৈষম্যের শিকার।[৮] পুরুষতন্ত্র কি? পুরুষতন্ত্র হচ্ছে একটি সামাজিক তত্ত্ব বা

---

[৪] অনুপম হায়াত, *গণমাধ্যম ও নারী*, সমাচার প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১১।

[৫] শামীমা চৌধুরী, *সংবাদ মাধ্যমে নারী*, পথ চলার বাধা কোথায়, নিরীক্ষা, মার্চ- এপ্রিল, ২০০৮, পৃ. ১০।

[৬] *The Daily Star*, আহমদ ইশতিয়াক, নারী সাংবাদিকতার অগ্রদূত নুরজাহান বেগম, রবিবার, জুন ৪, ২০২৩।

[৭] অনুপম হায়াত, *গণমাধ্যম ও নারী*, সমাচার প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃ. ২১।

[৮] হায়াত, *গণমাধ্যম ও নারী*, সমাচার প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১৬।

মতবাদ যা বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থাকে বোঝায়। যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ এখানে সুবিধাভোগী শ্রেণি আর নারী এখানে দুর্বল তাই নারীর উপরে অযৌক্তিক নিয়ম চাপিয়ে এক প্রকার বৈষম্যমূলক কর্তৃত্ব করা হয় এই তত্ত্ব দিয়ে। পুরুষতন্ত্র দিয়ে এখানে ব্যক্তি পুরুষকে বোঝানো হয়নি। মোট কথা এটা একটা সামাজিক বৈষম্যমূলক প্রথা যা নারীকে শোষণের জন্য ব্যবহার করা হয়।[৯]

ঢাকা প্রকাশের নারী বিষয়ক খবরগুলোর অবস্থানগত বিষয় বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে নারী বিষয়ক খবরগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় কখনো স্থান পায়নি। এমনকি শেষ পৃষ্ঠায়ও না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাঝের পৃষ্ঠার ভেতরের কোনো কলামে খুব ছোট পরিসরে খবরগুলো ছাপা হয়েছে। পরবর্তীতে কোনো কোনো সময় দুই বা তিন কলাম জুড়ে তা থাকলেও কখনই প্রথম বা শেষ পৃষ্ঠার সংবাদ নারীরা হতে পারেনি। পত্রিকায় সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায়, একটু কম গুরুত্বপূর্ণ খবর শেষ পৃষ্ঠায় এবং ক্রমান্বয়ে তারপরে মাঝের পৃষ্ঠাগুলোতে সংবাদ ছাপা হয়। সেদিক বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছানো যায় যে খুব গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম নারীরা কখনো হয়নি। একদিকে যেমন পত্রিকাটি খুবই নগণ্য পরিমাণ জায়গা নারী বিষয়ক খবরের জন্য ব্যবহার করেছিল, অন্যদিকে নারী বিষয়ক খবরগুলো ভালো মূল্যায়নও পায়নি। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে দেখা গেছে সংবাদপত্রে দেশের নারীর পাশাপাশি বিদেশের নারী বিষয়ক খবরও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। সবশেষে বলা যায়, তৎকালীন সময়ে ঢাকার নারী বিষয়ক তথ্য উদঘাটন করার জন্য *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা একটি মহামূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় নারী বিষয়ক অসংখ্য খবর রয়েছে তাদের সামাজিক প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে যা থেকে নারীদের প্রতি তাদের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবই প্রকাশ পায়। গবেষণার স্বার্থে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা প্রায় ১০০ বছরের সংখ্যা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। সেখানে শুরুর দিকের সংখ্যায় নারী বিষয়ক কোনো খবর আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। নারীর ছবি সংবলিত বিজ্ঞাপনের সূচনা হয় ১৮৯০ সালের দিকে, যেটাতে কোনো খবর ছিল না। *পোদ্দারি দোকান* শিরোনামে নারীর ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া ছিল এখানে। এটা অলংকারের বিজ্ঞাপন ছিল।[১০] পরবর্তীতে নারী বিষয়ক খবর প্রকাশিত হলেও খুবই কম পরিমাণ জায়গা নারী বিষয়ক খবর প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। খুবই অল্প কথায় এবং অল্প পরিসরে যে খবরগুলো ছাপা হয়েছিল শুরুর দিকে সেগুলোতে ছিল না কোনো শিরোনামও।

---

[৯] *Women Chapter Towards A Change*, আগস্ট ১৩, ২০১৭।

[১০] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ মাঘ, ১২৯৬, রবিবার, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০, ২৯শ ভাগ, ৪৩শ সংখ্যা।

নারী বিষয়ক খবরের বিষয়বস্তু

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় নারী বিষয়ক খবরগুলোর বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হলো :

১. নারীর সামাজিক অবস্থা

তৎকালীন সময়ে নারীদের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ ও বেদনাদায়ক। পর্দা প্রথার আড়ালে তাদের জীবন ছিল সকল রকম কুসংস্কার ও উৎপীড়ন প্রথা দ্বারা নিপীড়িত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর জীবনকে করে তুলেছিল ক্ষতবিক্ষত। অসংখ্য অমানবিক প্রথা প্রচলিত ছিল নারীর জীবনে। বহুকাল এই অবস্থা চললেও উনিশ শতকে এসে সমাজ সংস্কারকগণ এসকল বিভিন্ন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেন। যেমন- বাল্য বিয়ে, সতীদাহ প্রথা, অবরোধ প্রথা, কুলীন প্রথা ইত্যাদি।[১১] সতীদাহ প্রথা ছিল বাঙালি হিন্দুসমাজের একটি বর্বরোচিত অধ্যায়। এ প্রথায় জীবিত স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সাথে চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো। বাংলার যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে গর্ত খনন করে স্বামীর সাথে স্ত্রীকে হত্যা করা হতো।[১২] একজন নারীর জীবন তার স্বামীর জীবন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কি ভয়ংকর প্রথা ছিল তা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। অন্তঃসত্ত্বা নারীরা বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত রেহাই পেলেও বাচ্চা হওয়ার পরে স্বামীর ব্যবহৃত জিনিসপত্রসহ তাকে একই চিতায় উঠতে হতো। কোলের দুধের শিশুকে ফেলে দিয়ে চিতায় উঠতে হতো নারীকে।[১৩] তবেই একজন নারী সতীর মর্যাদা লাভ করতো। সবাই সেই সতী নারীর সিঁদুর নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিত।[১৪] নারীর সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তা এই প্রথা থেকে সহজেই অনুমেয়। মূলত বিধবা নারীকে সম্পত্তির ভাগ এবং তার ভরণপোষণের ভার ছিল সমাজের কাছে বোঝাস্বরূপ। এটা থেকে মুক্তির জন্যই সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়েছিল এই নারীহত্যা। যেটা ১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় আইন করে রহিত করা হয়।[১৫] তারপরেও অনেক স্থানেই এই প্রথা দেখা যায়। এ বিষয়টিকে গোঁড়া হিন্দুরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। সতীদাহ প্রথা রহিত হলেও সমাজে বিধবা নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। মাথামুণ্ডন, সাদা শাড়ি পরা, নিরামিষ ভোজন, শক্ত কাঠের বিছানা, এক বেলা আহার, অলংকার বর্জন ইত্যাদি ছিল তাদের বৈধব্য জীবন। কোনো পুরুষের দিকে তাকানো ছিল তাদের জন্য মহাপাপ স্বরূপ। এই ব্রত পালন করতে হতো আমৃত্যু পর্যন্ত। তাদের এই কঠিন জীবন থেকে কোনো মুক্তি ছিল না। সেটা শিশু বিধবা থেকে বয়স্ক বিধবা সবার জন্যই একই নিয়ম ছিল। সতীদাহ প্রথা রহিত করা হলেও নারীদের এই অসহ্য বৈধব্য জীবন

---

[১১] আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২৩।

[১২] মাহমুদ শামসুল হক, *বাঙালি নারী*, *হাজার বছরের বাঙালি নারী*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৩১।

[১৩] স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১১৪।

[১৪] বিনয় ঘোষ, *কলকাতা শহরের ইতিহাস*, পুস্তক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১১৪।

[১৫] আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা-২০২৩, পৃ.

তাদের কাছে ছিল চিতায় আগুনে পোড়ার মতোই ভয়ংকর। তাই সমাজ তাদেরকে জোরপূর্বক চিতায় না ওঠালেও তারা নিজেরাই এই ভয়ংকর জীবন থেকে মুক্তি লাভের জন্য অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নিত।

যেমন- ৫ আগস্ট, ১৯০০ সালের ৮ নং পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে বিধবা নারীর আত্মহত্যার খবর প্রকাশিত হয়েছে। টাঙ্গাইলের ফতেহপুর গ্রামের তারানাথধর নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরদিন ভোরে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সাথে নদীতে গোসল করতে যান। স্বামীর মৃত্যু তার অসহনীয় লাগছিল। সেই জন্য তিনি গোসল করার অজুহাতে পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করেন। আবার কলকাতার মুচিপাড়া থানার কানাই ধরের লেনে মনমোহিনী দেবী নামে ২০ বছর বয়সী ব্রাহ্মণ রমণী বিধবা হলে সে তার স্বামী বিয়োগ মেনে না নিতে পেরে আত্মাহুতি দিয়েছিল। তখনকার সময়ে নারীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল স্বামীর ঘরের সংসার করা। তাদের নিজেদের কোনো অবলম্বন ছিল না। তাই স্বামী বিয়োগ তারা মেনে নিতে পারতো না। আবার নতুন করে বিয়ে করার অধিকারও তাদের ছিল না। সেজন্য উত্তর-পশ্চিমের ফতেহপুর জেলার এক গ্রামে জনৈক ব্যক্তি পাগল হলে তার ভালো হওয়ার কোনো আশা না দেখে তার স্ত্রী হতাশ হয়ে নিজের ঘরে আগুন দিয়ে পুড়ে আত্মহত্যা করেন।[১৬] এ খবরটিও *ঢাকা প্রকাশের* একই সংখ্যা থেকে পাওয়া যায়। এ সকল মৃত্যু থেকে নারীদের তৎকালীন সময়ে সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় ।

নারীর জীবনের আরেকটি ভয়ংকর জীবন বিধান ছিল তা হলো অবরোধ প্রথা। এই প্রথা শুধু মুসলমান নারীর জন্যই না প্রযোজ্য ছিল হিন্দু নারীদের জন্যও। তবে হিন্দুদের বিয়ের পর থেকে এই জীবন শুরু হলেও মুসলিম নারীদের ৫ বছর হওয়ার পর থেকে এই প্রথার নিগড়ে বন্দি থাকতে হতো।[১৭] আর বিয়ের পর নারীরা ঘোমটা টেনে ঘরের সব কাজ করতো কোনো কথাও বলতে পারতো না কারো সাথে। এ যেন জেলখানায় বন্দী জীবন কাটানোর মত অবস্থা ছিল।

সমাজে আরেকটি ঘৃণ্য প্রথা ছিল প্রচলিত, তা হচ্ছে বাল্য বিয়ে। সে সময় নারীদের ছিল না কোনো শৈশব এবং কৈশোর। এসব খেলাধুলার বয়সেই তারা বউ হয়ে যেত অন্যের সংসারে আর অবরোধ প্রথায় জীবন বন্দি হতো। আর বিধবা হলে স্বামীর সাথে সহমরণে যেতে হতো। খেলার বয়স পাড় না হতেই অনেক বালিকা বধূ বিধবা হয়ে সারাটি জীবন মানুষের নিগ্রহের পাত্রী হয়ে কাটিয়ে দিত। এই ছিল নারীদের জীবনের বাহ্যিক চিত্র। কালে কালে নারীদের এই হেন অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সংস্কারকগণ পত্রপত্রিকায় নারীর অবস্থা তুলে ধরে সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করেছে।

---

[১৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ আগস্ট, ১৯০০, রবিবার, ২১ শ্রাবণ, ১৩০৭, ৪০ ভাগ, ২১শ সংখ্যা, কলাম-৩য়, পৃষ্ঠা, ৮

[১৭] রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *অবরোধবাসিনী*, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা কর্তৃক পুণর্মুদ্রিত, ঢাকা, ১৯৯৮।

পত্রপত্রিকা জনসচেতনতা তৈরি করার বলিষ্ঠ এক মাধ্যম। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় একশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়। এ সময় নারীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খবর প্রকাশিত হয়, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সেখানে অসংখ্য নারী নির্যাতনমূলক খবর, যেমন- ধর্ষণ, হত্যা, (পরকীয়ার কারণে হত্যা, মিথ্যা সন্দেহে হত্যা, নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা) ইত্যাদির খবর পাওয়া যায়। নারীরা আত্মহত্যাও করতো এবং গুমও হতো। তৎকালীন সময় সমাজে নারীদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। তারা বাইরে তো বটেই এমনকি ঘরের ভেতরেও নিরাপদ ছিল না। কারণ ঘরের ভেতর থেকে উঠিয়ে নিয়ে নারীদের ধর্ষণ করা হতো। নারীরা এত পর্দা প্রথার ভেতরে থাকার পরেও এমন ঘটনা ঘটতো অহরহ এবং বিচারব্যবস্থা নারীর পক্ষে ছিল না। কারণ ধর্ষিতা নারীর পক্ষে রায় দিয়ে অপরাধীর শাস্তি প্রদান খুব কমই দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের সংখ্যায় কোনো শিরোনাম ছাড়া পঞ্চম পৃষ্ঠার ৩য় কলামে নারীর ধর্ষণ সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশিত হয়।

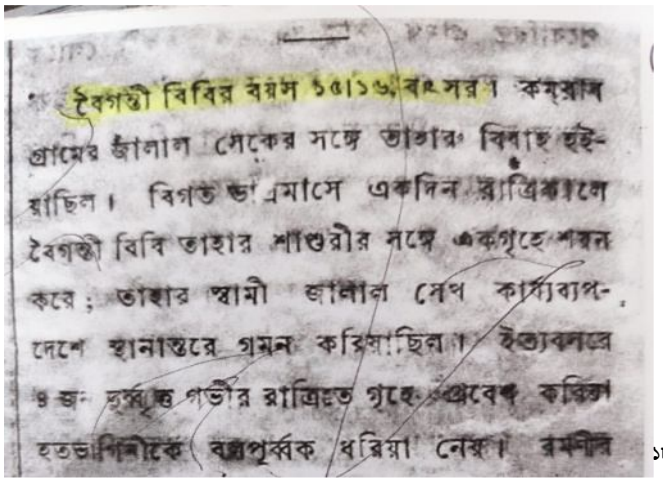

বৈগন্তী বিবির বয়স ১৫।১৬ বৎসর। কয়রাম
গ্রামের জালাল সেকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হই-
য়াছিল। বিগত ভাদ্র মাসে একদিন রাত্রিকালে
বৈগন্তী বিবি তাহার শাশুরীর সঙ্গে একগৃহে শয়ন
করে; তাহার স্বামী জালাল সেখ কার্য্যব্যপ-
দেশে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল। ইত্যবসরে
৪ জন দুর্বৃত্ত গভীর রাত্রিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া
হতভাগিনীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া নেয়। রমণীর [১৮]

ঢাকা প্রকাশ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২)

শিরোনামহীন নারী ধর্ষণের খবর

পত্রিকার সংবাদে দেখা যায়, ১৫/১৬ বছর বয়সী বৈগন্তী বিবি স্বামী বাড়িতে না থাকায় শাশুড়ির সাথে ঘুমিয়ে ছিল। গভীর রাতে চারজন দুর্বৃত্ত তাকে ধরে নিয়ে যায় তার শাশুড়ির সামনেই। নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মৃতপ্রায় নারী ভোরে গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং নারীটি বিচার চাইলে আসামীগণকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয়। ধর্ষণের মতো নৃশংস অন্যায়ের কোনো শাস্তি অপরাধী পায় না। সে কারণে সমাজে ধর্ষণ এত বেশি প্রচলিত ছিল।

[১৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২খ্রি., ২০ মাঘ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ঢাকা, তৃতীয় কলাম, পৃ. ৫।

ঢাকা প্রকাশের ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ সংখ্যার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ২য় ও ৩য় কলামে[১৯] এবং ২৩ মার্চ ১৯০২ সংখ্যায় ৬ নং পৃষ্ঠার প্রথম কলামে ধর্ষণের আরেকটি সংবাদ পাওয়া যায়।[২০]

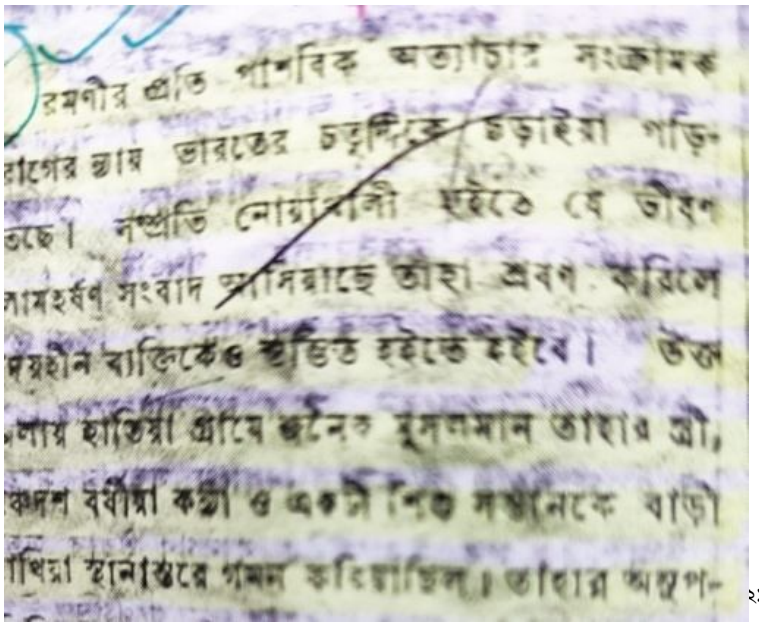
রমণীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার সংক্রামক
রোগের ন্যায় ভারতের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ি
তেছে। সম্প্রতি নোয়াখালী হইতে যে ভীষণ
নারীধর্ষণ সংবাদ আসিয়াছে তাহা শ্রবণ করিলে
হৃদয়হীন ব্যক্তিকেও স্তম্ভিত হইতে হইবে। উক্ত
জেলায় হাতিয়া গ্রামে জনৈক মুসলমান তাহার স্ত্রী,
চতুর্দশ বর্ষীয়া কন্যা ও একটি শিশু সন্তানকে বাড়ী
রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল। তাহার অনুপ-[২১]

ঢাকা প্রকাশ (২৩ মার্চ ১৯০২)

ঢাকা প্রকাশে নারী বিষয়ক খবরগুলো শিরোনাম ছাড়া প্রকাশ হতো। উপরোক্ত খবরে দেখা যায় নারীবিষয়ক কোনো শিরোনাম না থাকলেও ভেতরে ধর্ষণের খবর ছিল।

২১ আগস্ট, ১৯০৪ খ্রি. সংখ্যার চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে **পাপিষ্ঠের প্রতারণা** শিরোনামে আরেকটি ধর্ষণের খবর,[২২] ২১ আগস্ট, ১৯০৪ খ্রি. সংখ্যায় ৪ নং পৃষ্ঠার ২য় কলামে **পাপের প্রায়শ্চিত্ত** শিরোনামে ও নারী অপহরণ ও ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হয়।[২৩]

পর্দা প্রথার অন্তরালে থাকা নারীরা পারিবারিক জীবনেও পেত না তেমন কোনো সম্মান এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবেও তাদের অবস্থা ছিল চরম হতাশাজনক। ঘরের ভেতর, বাহির সব স্থানেই তারা অনিরাপদ ছিল। জীবনের তাগিদে ছোট ছোট পথশিশু ফুল বা ধুচনি বিক্রির জন্য পথে নামলে তাদের পরিণতিও ঘটতো ধর্ষণ এবং অনেক সময় খুনের মধ্য দিয়ে। নারী অপহরণ ও গুম করে রেখে অত্যাচার নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় ছিল। যারা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি জমিদারের কর্মচারী এরা ঠিকই বিচার ছাড়াই মুক্তি পেয়ে যেত।

---

[১৯] *ঢাকা প্রকাশ*, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ খ্রি., ২৭ মাঘ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪১ ভাগ, ৪৪শ সংখ্যা, কলাম- দ্বিতীয় ও তৃতীয়, পৃ: ৬।

[২০] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ মার্চ, ১৯০২ খ্রি., ৯ চৈত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, ৪১ ভাগ, ৫০শ সংখ্যা, রবিবার, ১ম কলাম, পৃ. ৬।

[২১] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ মার্চ, ১৯০২ খ্রি., ৯ চৈত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, ৪১ ভাগ, ৫০শ সংখ্যা, রবিবার, ১ম কলাম, পৃ. ৬।

[২২] *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ আগস্ট, ১৯০৪ খ্রি., ৫ ভাদ্র, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪৪ ভাগ, ১৯শ সংখ্যা, কলাম-২য়, পৃ. ৪।

[২৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ আগস্ট, ১৯০৪ খ্রি., ৫ ভাদ্র, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪৪ ভাগ, ১৯শ সংখ্যা, কলাম-২য়, পৃ. ৪।

বঙ্গভঙ্গ কালে ময়মনসিংহ জেলায় নারীদের নিয়ে ভয়ংকর পৈশাচিকতা হয়। অসংখ্য মা-বোনকে অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়। দেশ বিভাগের সময় নারীদের জীবন খুব অনিরাপদ হয়ে পড়ে।

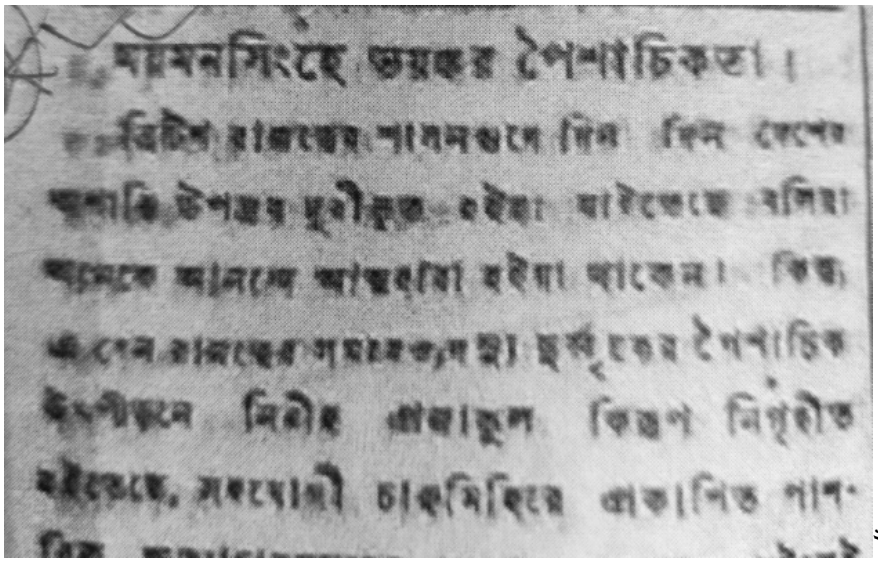
ময়মনসিংহে ভয়ঙ্কর পৈশাচিকতা।

[২৪]

ঢাকা প্রকাশ (২ জুলাই, ১৯০৫)

বঙ্গভঙ্গ কালে ময়মনসিংহের নারীদের সাথে পৈশাচিকতা

নারীদের ধর্ষণ পরবর্তী জীবন ছিল ভয়াবহ। তারা পরিবারে অপয়া হিসেবে বেঁচে ছিল। পরিবারের লোকজন সমাজচ্যুত হতেন এবং এক ঘরেও করে রাখা হতো অনেক সময়। সামাজিকভাবে পুরো পরিবারকেই সইতে হতো অপমান ও অবহেলা। অনেক সময় ধর্ষিতা নারী বেছে নিত আত্মহত্যার পথ।[২৫] স্বামী অনেক সময় আর গ্রহণ করতে চাইতো না তাদের। নারীদের ধর্ষণের জন্য রাষ্ট্র কাঠামোর দুর্বলতা ছিল অনেকাংশই দায়ী। কারণ রাষ্ট্র নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ ছিল। তারা আসলে ব্যর্থ ছিল নাকি উদাসীন ছিল সেটাই একটা ভাবনার বিষয়। নারীদের জীবনের মূল্য রাষ্ট্রের কাছে ছিল গৌণ হিসেবে। এজন্যই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দ্বারাই নারীরা হয়েছে অপহৃত এবং ধর্ষিত।

যেমন- ৪ জুলাই, ১৯২০ সংখ্যার ৪ নং পৃষ্ঠায় **রমণীর উপর অত্যাচার** শিরোনামে নারী ধর্ষণের দুটি ঘটনা *ঢাকা প্রকাশে* ছাপা হয়। একটি ছেলে পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের বিবরণ এবং আরেকটি ছিল শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক অত্যাচারের বিবরণ।[২৬]

নারী অপহরণের অনেক খবর *ঢাকা প্রকাশ* তুলে ধরেছে। যেখানে ধর্ষণের বিষয়টি উল্লেখ ছিল না তবে অপহরণের বর্ণনা ছিল। শুধু যুবতী মেয়েরা অপহৃত হতো তা নয় গৃহে প্রবেশ করে স্বামীর সামনে

[২৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ জুলাই, ১৯০৫ খ্রি., ১৮ আষাঢ়, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪৫ ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ১ম ও ২য় কলাম, পৃ. ৫।

[২৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ খ্রি., ২০ মাঘ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ঢাকা, তৃতীয় কলাম, পৃ. ৫।

[২৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ জুলাই, ১৯২০ খ্রি. ঢাকা, ২০ আষাঢ়, রবিবার, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ৬০ ভাগ, ১২শ সংখ্যা, পৃ. ৪।

থেকেও অনেক সময় অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে বিবাহিত নারীদেরকেও। যেমন- ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ সংখ্যার ৭ নং পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে **রমণী হরণ** শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়।

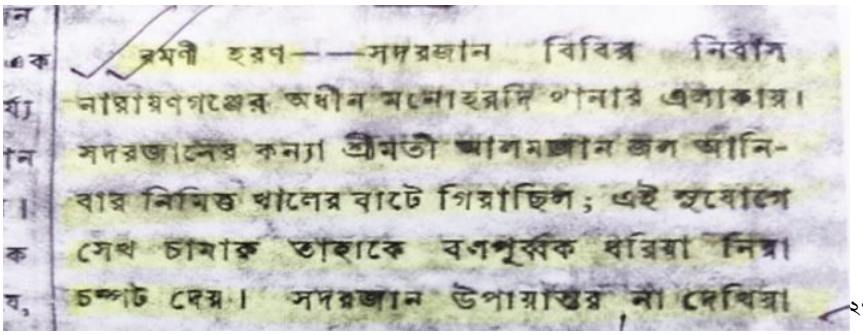

রমণী হরণ——সদরজান বিবির নিবাস নারায়ণগঞ্জের অধীন মনোহরদি থানার এলাকায়। সদরজানের কন্যা শ্রীমতী আসমজান জল আনি- বার নিমিত্ত খালের ঘাটে গিয়াছিল; এই সুযোগে সেখ চামারু তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া নিয়া চম্পট দেয়। সদরজান উপায়ান্তর না দেখিয়া [27]

ঢাকা প্রকাশ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২)

৬ এপ্রিল ১৯০২ সংখ্যার ৮ নং পৃষ্ঠায় **রমনী হরণ** শিরোনামে আরেকটি খবর ছিল।

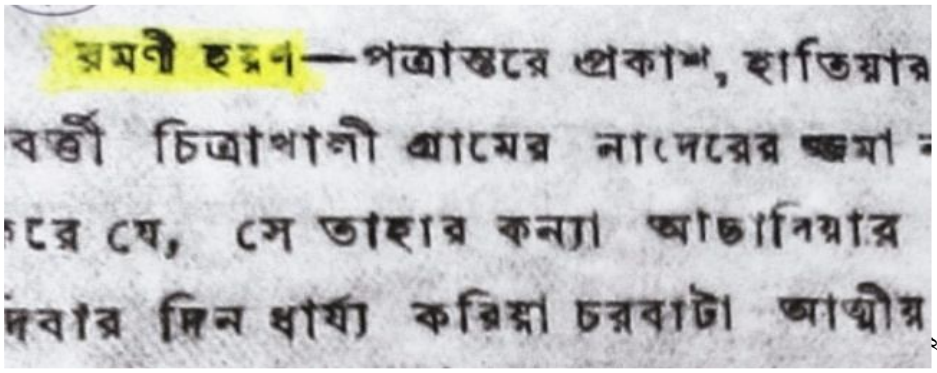

রমণী হরন—পত্রান্তরে প্রকাশ, হাতিয়ার
বর্ত্তী চিত্রাখালী গ্রামের নাদেরের জমা
করে যে, সে তাহার কন্যা আছানিয়ার
দিবার দিন ধার্য্য করিয়া চরবাটা আত্মীয় [28]

ঢাকা প্রকাশ (৬ এপ্রিল ১৯০২)

২ জুলাই ১৯০৫ সংখ্যার ৪ নং পৃষ্ঠার ৩য় কলামে দুর্বৃত্তের কাণ্ড শিরোনামে নারী অপহরণ বিষয়ক সংবাদ প্রকাশ হয়।

ঢাকা প্রকাশ।

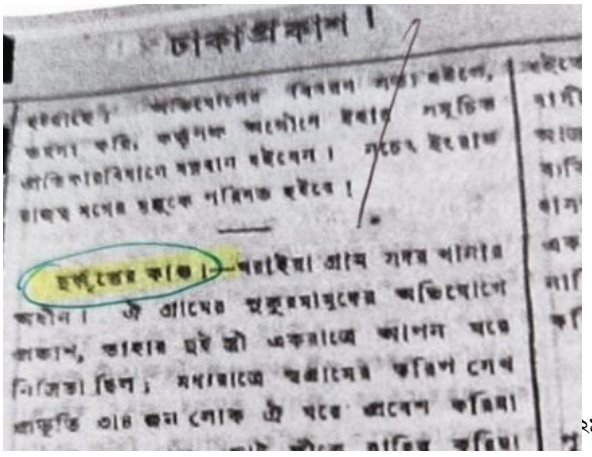

দুর্ব্বৃত্তের কাণ্ড।—[illegible] গ্রাম [illegible] থানার অধীন। ঐ গ্রামের [illegible] অভিযোগে প্রকাশ, তাহার দুই স্ত্রী একরাত্রে আপন ঘরে নিদ্রিতা ছিল; মধ্যরাত্রে [illegible] প্রভৃতি ৩।৪ জন লোক ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া [29]

ঢাকা প্রকাশ (২ জুলাই ১৯০৫)

---

[27] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ খ্রি., ২০ মাঘ, ১৩০৮, রবিবার, ৪১ ভাগ, ৪৩শ সংখ্যা, কলাম-২য়, পৃ. ৭।
[28] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ এপ্রিল ১৯০২ খ্রি., ২৩ চৈত্র, ১৩০৮,রবিবার, ৪১ ভাগ, ৫২শ সংখ্যা, পৃ. ৮।
[29] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ জুলাই ১৯০৫ খ্রি., ১৮ আষাঢ়, ১৩১২, রবিবার ৪৫ ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ৩য় কলাম, পৃ. ৪।

সমাজে নারী অনিরাপদ ছিল শুধু তাই নয় পরিবারেও নারী ছিল অনিরাপদ। পারিবারিক সকল নির্যাতনের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে নারীরা হতো হত্যার স্বীকার পর্যন্ত। এ সকল হত্যার কারণ হিসেবে ছিল স্বামীদের অন্য নারীর সাথে পরকীয়ার সম্পর্ক, বেশ্যা আসক্তি ইত্যাদি। এমনকি তারা অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়া সন্দেহের বশবর্তী হয়েও নারীদের হত্যা পর্যন্ত করতো। কারণ তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনে স্ত্রীরা ছিল বাধাস্বরূপ। যার ফল হচ্ছে স্ত্রী হত্যা। যেমন- ৬ এপ্রিল ১৯০২ সংখ্যার ৬ নং পৃষ্ঠার প্রথম কলাম[৩০] এবং ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ সংখ্যার ৮ নং পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে **সন্দেহে সর্বনাশ** শিরোনামের খবর দ্রষ্টব্য।[৩১]

নারী কর্তৃক খুনের সংবাদ

ঢাকা প্রকাশ শুধু নারী নির্যাতনের খরবই না, বরং অপরাধী নারীদের খবরও তুলে ধরেছিল বিভিন্ন সময়।

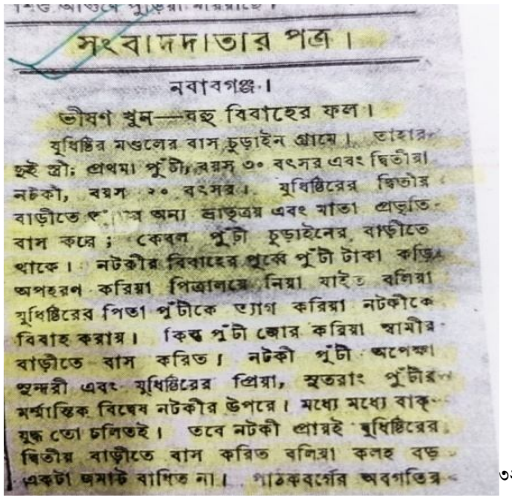

সংবাদদাতার পত্র।

নবাবগঞ্জ।

ভীষণ খুন—বহু বিবাহের ফল।

যুধিষ্ঠির মণ্ডলের বাস চুড়াইন গ্রামে। তাহার দুই স্ত্রী; প্রথমা পুঁটী, বয়স ৩০ বৎসর এবং দ্বিতীয়া নটকী, বয়স ২০ বৎসর। যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় বাড়ীতে [illegible] অন্য ভ্রাতৃত্রয় এবং মাতা প্রভৃতি বাস করে; কেবল পুঁটী চুড়াইনের বাড়ীতে থাকে। নটকীর বিবাহের পূর্ব্বে পুঁটী টাকা কড়ি অপহরণ করিয়া পিত্রালয়ে নিয়া যাইত বলিয়া যুধিষ্ঠিরের পিতা পুঁটীকে ত্যাগ করিয়া নটকীকে বিবাহ করায়। কিন্তু পুঁটী জোর করিয়া স্বামীর বাড়ীতে বাস করিত। নটকী পুঁটী অপেক্ষা সুন্দরী এবং যুধিষ্ঠিরের প্রিয়া, সুতরাং পুঁটীর মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ নটকীর উপরে। মধ্যে মধ্যে বাক্যুদ্ধ তো চলিতই। তবে নটকী প্রায়ই যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় বাড়ীতে বাস করিত বলিয়া কলহ বড় একটা জমাট বাধিত না। পাঠকবর্গের অবগতির [৩২]

ঢাকা প্রকাশ (৫ জানুয়ারি ১৯০২)

তৎকালীন সময়ে পুরুষরা একাধিক বিয়ে করে একসাথে সংসার করলেও নারীর দ্বিতীয় বিয়ে করার কোনো অধিকার ছিল না এবং সকল নির্যাতন সহ্য করে নিরুপায় হয়ে তারা সংসার করতো মুখ বুজে। নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অবহেলিতপূর্ণ। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে তারা যুগ যুগ ধরে নিগ্রহের শিকার হওয়ায় তাদের মধ্যেও চারিত্রিক স্খলন এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে অনেক ক্ষেত্রেই। নারীরাও বিভিন্ন রকম অপরাধ করে ফেলতো। বেশিরভাগ অপরাধই স্বামী স্ত্রীর পারিবারিক কলহের জের ধরে হতো। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে মানতে না পেরে নবাবগঞ্জের চুরাইন গ্রামের যুধিষ্ঠির মণ্ডলের প্রথম স্ত্রী পুঁটি দ্বিতীয় স্ত্রী নটকী কে হত্যা করে।

---

[৩০] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ এপ্রিল ১৯০২ খ্রি., ২৩ চৈত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪১ ভাগ ৫২শ সংখ্যা, কলাম -১ম, পৃ. ৬।

[৩১] *ঢাকা প্রকাশ*, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ খ্রি., ২৭ মাঘ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪১ ভাগ, ৪৪শ সংখ্যা, কলাম -২য়, পৃ. ৮।

[৩২] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ জানুয়ারি, ১৯০২ খ্রি., ২১ পৌষ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪১ ভাগ, ৩৯শ সংখ্যা, কলাম -৩য়, পৃ. ৮-৯।

আবার বরিশালের মটরবাড়িয়া থানার রূপদ্রোণ গ্রামের জনৈক নমঃশূদ্র পূর্ণচন্দ্রের স্ত্রী পরকিয়ায় লিপ্ত হয়ে স্বামীকে হত্যা করে।[৩৩] দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরেও জায়গা জমি নিয়েও হত্যার মতো ঘটনা নারীরা ঘটায় যা ২ ফেব্রুয়ারি **১৯০২** সংখ্যায় ৭ নং পৃষ্ঠার ২য় কলামের সংবাদ থেকে জানা যায়।

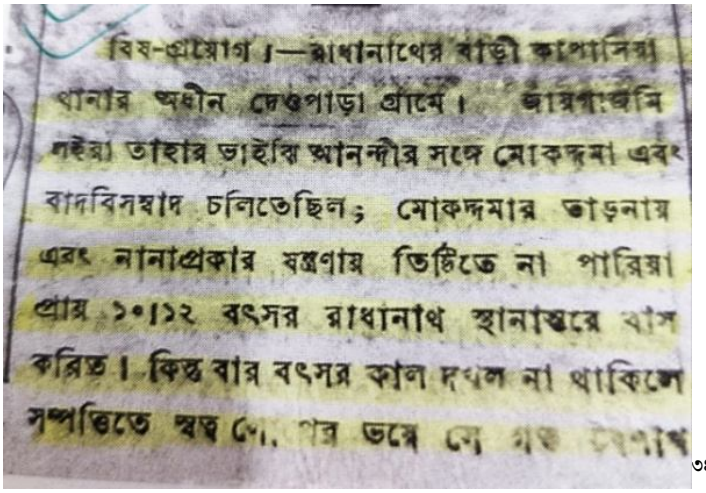

বিষ-প্রয়োগ।—রাধানাথের বাড়ী কাপাসিয়া থানার অধীন দেওপাড়া গ্রামে। জায়গাজমি লইয়া তাহার ভাইঝি আনন্দীর সঙ্গে মোকদ্দমা এবং বাদবিসম্বাদ চলিতেছিল; মোকদ্দমার তাড়নায় এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় তিষ্টিতে না পারিয়া প্রায় ১০।১২ বৎসর রাধানাথ স্থানান্তরে বাস করিত। কিন্তু বার বৎসর কাল দখল না থাকিলে সম্পত্তিতে স্বত্ব [illegible] ভয়ে সে [illegible][৩৪]

ঢাকা প্রকাশ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২)

নারী কর্তৃক বিষপ্রয়োগে খুনের সংবাদ

উপরোক্ত সংবাদে দেখা যায়, কাপাসিয়া থানার রাধানাথের সাথে জায়গাজমি নিয়ে ঝগড়া চলায় তার ভাইজি রাধানাথের খাবারে বিষ মেশালে রাধানাথের দুই ছেলে তা খেয়ে মারা যায় এবং রাধানাথ গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়।

নারীদের মধ্যে উদার চিন্তাচেতনার জন্ম না হওয়ার জন্য শিক্ষার অভাব, বাল্যবিবাহ, সমাজ কর্তৃক আরোপিত কঠোর বিধান এ সকল কিছুই বাধাস্বরূপ ছিল। তাই এমন দু-চারটা নৈতিক অধঃপতনের সংবাদ নারীদের নিয়ে দেখা গেলেও তার পেছনে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীর প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনাই দায়ী ছিল বলে মনে করা হয়।

ঢাকার সমাজে আরেক শ্রেণির নারীর তথ্য পাওয়া যায়। যাদেরকে অনেক নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে যুগে যুগে। কখনো গণিকা, কখনো বারবনিতা বা কখনো বেশ্যা এমন অনেক নাম রয়েছে তাদের। *ঢাকা প্রকাশের* সূত্র মতে জানা যায় তৎকালীন সময়ে ঢাকায় এ শ্রেণির নারীর সরব উপস্থিতি ছিল। *ঢাকা প্রকাশের* ২৬ চৈত্র, ১৩০৬ সংখ্যায় **সচিত্র বেশ্যালীলা** শিরোনামে বিজ্ঞাপন দেখা যায়। সুবেদার ইসলাম খানের আমলে বাইজি প্রথার সূত্রপাত ঘটে এবং পরবর্তীতে ঢাকায় **১৯** শতকের দিকে প্রচুর পরিমাণে পেশাজীবী যৌনকর্মীদের তথ্য পাওয়া যায়।

---

[৩৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ খ্রি., ২৭ মাঘ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪১ ভাগ, ৪৪শ সংখ্যা, কলাম-২য়, পৃ. ৮।

[৩৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ খ্রি., ২০ মাঘ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪১ ভাগ, ৪৩শ সংখ্যা, ২য় কলাম, পৃ. ৭।

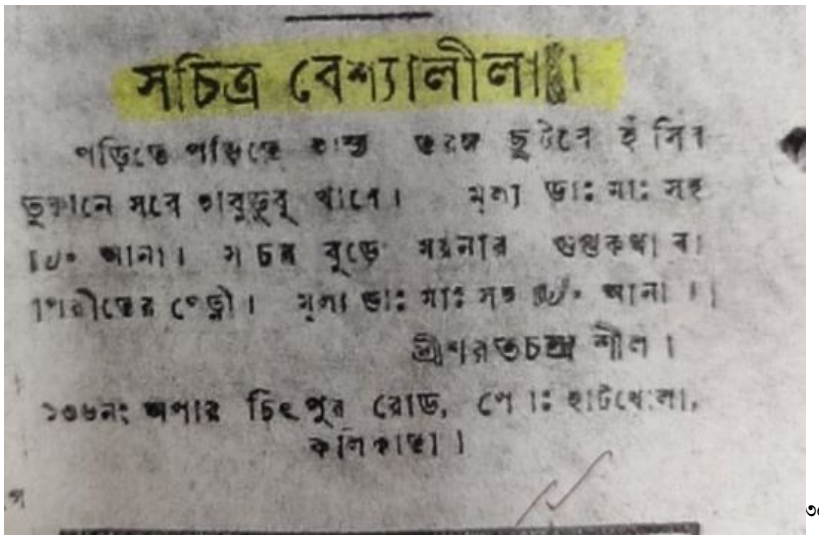

[৩৫]

ঢাকা প্রকাশ, (৮ এপ্রিল ১৯০০)

বঙ্গভঙ্গের পরেও ঢাকায় নবাবদের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক ভবন তৈরি হয়েছিল। যেখানে নেচে গেয়ে সে সকল নারীরা তাদের মনোরঞ্জন করতো। ২২ নভেম্বর ১৯০৩ সালে প্রকাশিত *ঢাকা প্রকাশের* তথ্য মতে ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল এক নর্তকীর সন্তানের অন্নপ্রাসন উৎসবে। তখন চার টাকায় এক মন চাউল পাওয়া যেত। সেসময় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল ছিল বলে তথ্য পাওয়া গেলেও তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল খুবই শোচনীয়।[৩৬] গণিকাবৃত্তি ঘৃণ্য হলেও সংবিধানে ১৮ বছরের উর্ধ্বে নারীর জন্য তা বৈধ করা হয়েছে। তবে আমাদের সংবিধানের ২য় ভাগের ১৮ অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, রাষ্ট্র এ ব্যবস্থা নিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।[৩৭]

২. নারীর স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও ঔষধ

১৯ শতকের পূর্ব পর্যন্ত নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার লক্ষ করলে দেখা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর সম্মান ও অধিকারের ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা হয়নি। পুরুষকে সমাজ অবাধ অধিকার দিলেও নারীকে রেখেছিল অবদমিত করে। যুগ যুগ ধরে নারী তাদের জীবিকার তাগিদে নির্ভরশীল ছিল পুরুষের উপর। বাল্যবিবাহ নিবারণ, সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ, বহুবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে । প্রতিটি সংসারে অসুস্থতা ও রোগ নিত্যদিনকার বিষয়। রোগীর সেবা করা হওয়া উচিত মানবধর্ম, অর্থাৎ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সবার সেবা করবে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে বিষয়টিও মোটেও তেমন ছিল না। সমাজ মনে করতো সেবা শুশ্রুষা শুধুই নারীদের কাজ। কারণ নারীরা দয়াবতী ও কোমল।[৩৮]

---

[৩৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ চৈত্র, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, ৮ এপ্রিল, ১৯০০ খ্রি., ৪০ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, রবিবার, পৃ. ১০।

[৩৬] সোনিয়া নিশাত আমিন, *ঢাকা নগর জীবনে নারী*,বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০।

[৩৭] *যায়যায় দিন সংবাদপত্র*, গণিক বৃত্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের আইন কি বলে, প্রকাশ ২১ মে, ২০২৪।

[৩৮] নিবেদিতা পাল, *উনিশ শতকে ভারতীয় নারী ও চিকিৎসাবিদ্যাঃ আধুনিকতার এক সমুজ্জ্বল প্রতিফলন* ।

কিন্তু নারীর অসুস্থতা ছিল সমাজে খুবই অবহেলিত বিষয়। ব্যক্তিমানুষই যখন অবহেলিত তখন তার অসুস্থতা যে কারো মনে খুব একটা ভাবাবেগ তৈরি করতো না তা সহজেই অনুমেয়। জন্মের সময় থেকে একজন কন্যা শিশু অবাঞ্ছিত বলে পৃথিবীতে আসে। বাচ্চা জন্ম দেওয়ার সময় নারীদেরকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। বিনা চিকিৎসা এবং ভুল কবিরাজিতে সেসময় অসংখ্য নারী দিত তাদের প্রাণ বিসর্জন। কঠোর পর্দা প্রথার আড়ালে থেকে নারীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ব্রিটিশরা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেও এ অঞ্চলে কবিরাজি, হেকিমি চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে সকল কবিরাজদেরকে নারীরা সরাসরি দেখাতে পারতেন না পর্দা প্রথার কারণে । খুব বেশি মারাত্মক অবস্থা হলে পর্দার অন্তরালে বসে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করতেন । রোগী না দেখে অনুমানের উপর দেয়া চিকিৎসা পদ্ধতি নারীদের জন্য খুব একটা কল্যাণকর ছিল না। এর মূল কারণ ছিল নারীর বাল্যবিবাহ। নারীদের স্বাস্থসংক্রান্ত মৌলিক অধিকারগুলো অনেক ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করার অভাবে তারা মৃত্যু মুখে পতিত হতো। নারীদের এসকল ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং মৃত্যুর খবরগুলো তৎকালীন সময়ের জনপ্রিয় পত্রিকা *ঢাকা প্রকাশ* তুলে ধরেছে অনেক ক্ষেত্রেই। যেমন- **১৯** জানুয়ারি, **১৯৩৬** খ্রি., ৫ মাঘ, **১৩৪২** বঙ্গাব্দ সংখ্যার ৩ নং পৃষ্ঠার ২য় কলামে **প্রসূতিদের অকাল মৃত্যু** শিরোনামে নারী স্বাস্থ্য নিয়ে খবর ছাপা হয়।

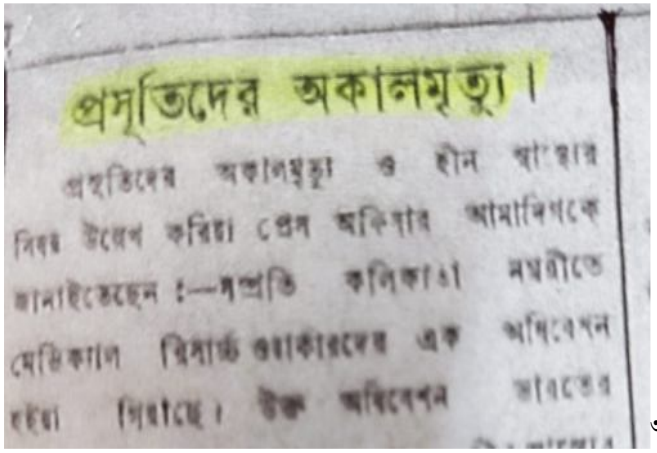
প্রসূতিদের অকালমৃত্যু।

প্রসূতিদের অকালমৃত্যু ও হীন স্বাস্থ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রেস অফিসার আমাদিগকে জানাইতেছেন :—সম্প্রতি কলিকাতা নগরীতে মেডিকাল রিসার্চ ওয়ার্কারদের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশন ভারতের[৩৯]

ঢাকা প্রকাশ (**১৯** জানুয়ারি **১৯৩৬**)

এক্লেমশিয়ায় প্রসূতিদের অকালমৃত্যু

নারীদের অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে তারা অল্প বয়সেই মা হয়। এ কারণে তারা অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। এমনকি বাচ্চা হওয়ার সময়ে তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। পত্রিকার রিপোর্টে ভারতবর্ষের নারীদের অকাল মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্লেমশিয়ায় বহু নারী আতুর ঘরেই মারা যান বলে পত্রিকাটি তুলে ধরেছে এবং শিশু মাতৃত্ব ও এই মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। **১৯৩১** সালের সেন্সাস থেকে বর্ণনা করা হয় ভারতের প্রতিটি নারী কমপক্ষে গড়ে চারটা

[৩৯] *ঢাকা প্রকাশ*, **১৯** জানুয়ারি, **১৯৩৬** খ্রি., ৫ মাঘ, রবিবার, **১৩৪২** বঙ্গাব্দ, ৭৫ বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা, কলাম-২য়, পৃ. ৩।

সন্তানের মা হয়ে থাকেন যা তার মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ায়।পত্রিকাটি উল্লেখ করে প্রতি বছর প্রায় দুই লক্ষ নারী মৃত্যুবরণ করে। এখানে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচারকার্য চালানোর প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয় এত নারীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে বাল্য বিবাহকেই দায়ী করা যায়। বাধ্য হয়ে ১৮৯১ সালে সরকার নারীদের সহবাসের বয়স সর্বনিম্ন ১২ তে উন্নীত করলেও তা বাস্তবায়ন করতে অনেক সময় লেগেছে।[৪০] তৎকালীন সময়ে নারীদের সন্তান জন্মদানের কাজ ঘরেই করা হতো। খুব প্রয়োজন হলে ধাত্রী ডাকা হতো। এমন মুহূর্তেও অসংখ্য নারীর মৃত্যু ঘটেছে।

ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক আমলে তাদের রাষ্ট্রের প্রজাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান ছিলেন না। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে নারী স্বাস্থ্যও যে গৌণ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু একটা সময় শ্বেতাঙ্গ সামরিক বাহিনীর সদস্যরা অনেকেই যৌন রোগে আক্রান্ত হতে থাকলো। কারণ পরিবারবিহীন তারা এ দেশে বসবাস করে বিধায় যৌন পল্লিতে যাতায়াত ছিল অনেক বেশি পরিমাণে। এ অবস্থায় সরকার তাদের সামরিক বাহিনীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় চিকিৎসা দেওয়া শুরু করে। ব্রিটিশ আমলে ইংলিশ সেনাদের ৬০% যৌন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে ১৮৬৪ সালে জনগণের নিবন্ধন শুরু হয় ক্যান্টনমেন্ট আইন অনুযায়ী এবং সেনাদের জন্য পতিতালয় ছিল ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে। এই আইনে বলা হয়, গণিকাদেরকে রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে হবে ও কার্ড নিতে হবে। স্বাস্থ পরীক্ষা করে এই কার্ড দেয়া হতো। তবেই তারা এই পেশা চালিয়ে যেতে পারবে। পতিতাদের ও ইংরেজি সেনাদেরকে বিভিন্ন যৌনরোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সেসময় সেনা ছাউনিগুলোতে **লক হসপিটাল** নামের বিশেষ হসপিটাল স্থাপন করা হয়েছিল। তবে অন্য সাধারণ পতিতাদের স্বাস্থ ঝুঁকি ছিল অনেক বেশি। তাদের জন্য আলাদা কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকে মৃত্যুর মুখে পতিত হতো। সিফিলিস এবং গনোরিয়ার মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতো তারা।[৪১] সাধারণ নারীদের আগে পতিতা নারীরা চিকিৎসা সুবিধা পায় ব্রিটিশ সেনাদের নিজেদের স্বার্থেই।

ঢাকা শহরে হাসপাতালের তথ্য পাওয়া যায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে। তখন নারীদের গৃহের বাইরে যাওয়া ছিল বারণ। তাই হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া তো চিন্তারও বাইরে ছিল। ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী সময়ে হাসপাতালে নারীদের কোনো আলাদা ওয়ার্ড এর তথ্য না পেলেও দেশ বিভাগের পরে মিটফোর্ড হাসপাতালে ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড খোলা হলেও কয়েক বছরের মধ্যেই আবার তা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে কিছু শিশুর জন্ম হাসপাতালে হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়।[৪২]

---

[৪০] সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৩।

[৪১] *ঔপনিবেশিক ভারতে পতিতাবৃত্তি*, উইকিপিডিয়া, https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_colonial_India

[৪২] শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ১৮৫৮-১৯৪৭*, একাডেমিক প্রেস ও পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৭) এবং মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩।

সব যুগেই নারী স্বাস্থ্য অবহেলিত ছিল। নারীরা নিজেরাও তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী নয়। শুরুর দিকে ঢাকার নারীর স্বাস্থ্য শুধুমাত্র অন্দরমহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসকরা এ ব্যাপারে সচেতনতা প্রদর্শন করে, তবে সেটা তারা নিজেদের প্রয়োজনীয়তা সবাইকে বোঝানোর জন্যই করেছিল, দীর্ঘদিন এদেশে টিকে থাকার এটাও ছিল একটা কৌশল মাত্র।[৪৩] *ঢাকা প্রকাশের* আলোকে তৎকালীন সময় নারীদের রোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। স্ত্রীরোগ ছিল ব্যাপক আকারে। অর্থাৎ স্ত্রীদের জরায়ুর রোগ। কারণ পত্রিকায় এ সকল রোগের অব্যর্থ ঔষধের অনেক বেশি বিজ্ঞাপন প্রকাশ হতো এবং অনেক সংখ্যায় দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞাপন দেয়া হতো।

তৎকালীন সময়ে নারীদের মধ্যে যে সকল রোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে জরায়ুর সকল ধরনের রোগ, যেমন-রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক স্রাব এবং গর্ভ দোষের জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব, গুল্ম, রজঃঅনির্গম, পেটে ব্যাথা, অকাল অনিয়মিত বা ঋতুকষ্ট, শিররোগ, দৌর্বল্য, মানসিক অবসাদ, আলস্য প্রভৃতি। তারা এ সকল রোগে অনেক বেশী কষ্ট পেত। তাদের জীবন ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তারা ঝুঁকির মধ্যে থাকলেও এ সকল রোগের কথা কাউকে বলতেও পারত না। তারা খুবই লজ্জা পেত।

নারীরা তখন সরাসরি কোনো চিকিৎসকের কাছে যেতোনা এসব রোগ সমাধান করার জন্য। এক্ষেত্রে *ঢাকা প্রকাশ* নারীদের এই সকল রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ঔষধের বিজ্ঞাপন দিত যেখানে নারীর পরিচয় গোপন রেখে ওষুধ প্রেরণ করার অঙ্গীকার থাকতো এবং এ সকল রোগের অব্যর্থ চিকিৎসার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতো। সেগুলো ছিল ভেষজ ঔষধ। মূল্য ছিল দুই টাকা থেকে চার টাকা। সর্বাধিক প্রকাশিত ঔষধের বিজ্ঞাপনের মধ্যে **অশোক** এবং **সুবাহু ঘৃত** অন্যতম। এছাড়াও স্ত্রীরোগের আরো কিছু ঔষধের নাম পাওয়া যায়। সুরমা, অশোকাসব এবং পুষ্পসার। সেগুলোর বড় শিশির মূল্য ছিল এক টাকা। যেমন- ২৪ শ্রাবণ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যার ৪ নং পৃষ্ঠায় **সুবাহু ঘৃত**[৪৪] এবং ২১ শ্রাবণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ সংখ্যার ১০ নং পৃষ্ঠার ৭ নং কলামে **স্ত্রীরোগে–অশোক** শিরোনামে নারী চিকিৎসার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

---

[৪৩] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক (২০০১), *আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস (১৮-২০) শতক*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ., ১৮, ২০, ৫৭-৬০, ১৮৭-১৮৮।

[৪৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ আগস্ট, ১৯০০ খ্রি., রবিবার, ২১ শ্রাবণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, ৪০ ভাগ, ২১শ সংখ্যা, কলাম-৭, পৃ. ১০।

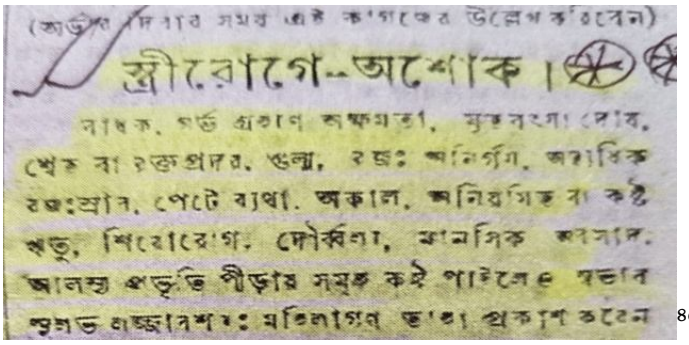

[৪৫]

ঢাকা প্রকাশ (৫ আগস্ট ১৯০০)

স্ত্রীরোগ এর চিকিৎসায় অশোক এর বিজ্ঞাপন

চিকিৎসা পদ্ধতি যে নারীদের জন্য খুব বেশি কল্যাণকর ছিল না তা বোঝা যায় **১৮৮১** সালের আদমশুমারি থেকে। সেখানে বলা আছে ঢাকায় বিবাহিত নারীদের মৃত্যুর হার অনেক বেশি। নারী মৃত্যুর কারণ হিসেবে বাল্যবিবাহকেই দায়ী করা যায়।[৪৬]

সে সময় নারীদের গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। তারা যে আয়োডিনের অভাবে ভুগতো এই রোগ থেকে ধারণা করা যায়। নারীদের মধ্যে ব্যাপক আকারে এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। *ঢাকা প্রকাশে* গলগণ্ড রোগের ঔষধের বিজ্ঞাপন ছিল এবং বিজ্ঞাপনে বোঝানো হয় এই রোগটি নারীদেরই বেশি হতো। এ রোগে গলা একদম ফুলে যেত। ঔষধের বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তারের নাম সহ বিজ্ঞাপন এবং ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা দেয়া থাকতো। যেমন- ২ বৈশাখ, **১৩৩৫** বঙ্গাব্দ সংখ্যার ৭ নং পৃষ্ঠার ৩য় কলামে ডাক্তার কর্নেল সাহেবের **'গয়টার কিওর'** গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের একমাত্র মহৌষধ শিরোনামে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। যেখানে ২ জন নারীর ছবিসহ বিজ্ঞাপন ছিল। একটিতে সাধারণ নারীর ছবি আরেকটি গলগণ্ডসহ ছবি। ঔষধটা কতটা কার্যকরী এ চিত্রের মাধ্যমে তা বোঝানো হয়েছে।

[৪৭]

ঢাকা প্রকাশ (২ বৈশাখ, ১৩৩৫)

---

[৪৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ আগস্ট, ১৯০০ খ্রি., রবিবার, ২১ শ্রাবণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, ৪০ ভাগ, ২১শ সংখ্যা, কলাম-৭, পৃ. ১০।

[৪৬] সোনিয়া নিশাত *আমিন*, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, বাংলা একাডেমি, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৯৮।

[৪৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ বৈশাখ, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ১৫ এপ্রিল, ১৯২৮ খ্রি., ৬৮ ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৭।

এ ছবি থেকে নারীদের গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে যেমন ধারণা পাওয়া যায় তেমনভাবে নারীদের পোশাক এবং সাজ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

উপরোক্ত তথ্য থেকে তৎকালীন নারীদের রোগের ধরন বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নারীদের যে সকল রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল বিশেষ করে জরায়ু সংক্রান্ত রোগগুলোর জন্য বাল্যবিবাহ এবং শিশু মাতৃত্বই ছিল অন্যতম কারণ। আর চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল ঘরোয়া পদ্ধতিতে। ভেষজ বা কবিরাজিতে করা হতো নারীদের চিকিৎসা। আর সন্তান জন্মদানের কাজ ধাত্রীদের হাতেই নিয়োজিত ছিল। পরবর্তীতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় বলে ধারণা করা যায়। ফল হিসেবে পত্রিকায় নারীদের সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়।

৩. নারীর পোশাক, প্রসাধন ও সৌন্দর্য বিধান

মানুষের সাথে পোশাকের সম্পর্ক বহু পুরনো। প্রাচীন গুহা মানব থেকে আধুনিক মানুষ সবার জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হচ্ছে পোশাক। তবে সময়ের সাথে এবং গোত্রভেদে ছিল পোশাকের ভিন্নতা। আবহাওয়া ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের পোশাক নির্বাচনে ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে এতে ভূমিকা রাখে অর্থনীতি এবং নিজেদের রুচিবোধও।

বিভিন্ন সময়ে পোশাক ও বাঙালিদের অন্য সব কিছুর মতোই পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় সেলাই করা কাপড় পড়াকে অপবিত্র মনে করা হতো এক সময়। সেজন্যই নারী পুরুষ শাড়ি ও ধুতি পড়তেন তখন। পর্দা প্রথার কঠোরতার কারণে পুরুষদের পোশাকের ভিন্নতা সম্পর্কে জানা গেলেও নারীদের পোশাক সম্পর্কে জানা যায় না। ব্রিটিশ শাসনের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে এসে অভিজাত নারীদের ফুলহাতা এবং গলা বন্ধ ব্লাউজ পরতে দেখা যায়। অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে উর্দুভাষী নারীদের অনেকে সালোয়ার কামিজ পড়লেও বাঙালি মুসলিম নারীরা তা পরতেন না। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে ঢাকার নারীদের পোশাকের দিকে তাকালে দেখা যায় হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের নারীরাই অন্দরমহলে শাড়ি পরিধান করতেন। তবে উচ্চবিত্ত মুসলিম নারীদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তর ভারতীয় কুর্তা, সালোয়ার, দোপাট্টা পড়তে পছন্দ করতেন।[৪৮] নারীদের পর্দা প্রথার সাথে একেবারেই বেমানান হলেও সপ্তদশ শতকের অন্দরমহলের নারীরা কোনো রকম অন্তর্বাস ছাড়াই শরীরে শাড়ি জড়িয়ে রাখতো। তবে ধনী মহিলারা শাড়ির নিচে বক্ষ বন্ধনী এবং কখনো পায়জামার মতো পরিধান করতেন।[৪৯] *ঢাকা প্রকাশে* বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে নারী ছবি সংবলিত অসংখ্য বিজ্ঞাপন। যেখান থেকে তৎকালীন সময়ের ঢাকার নারীদের পোশাক সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

[৪৮] আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, বাংলা একাডেমি, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ১০০।

[৪৯] আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, বাংলা একাডেমি, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ১০৩।

১৮৯০ সালে *ঢাকা প্রকাশে* প্রকাশিত ছবিতে নারীর পরনে ছিল শাড়ি তবে কোনো ধরনের ব্লাউজ বা বক্ষবন্ধনী ছিল না। এরপর আরো অসংখ্য চিত্রে নারীকে এমন আকর্ষণীয়ভাবেই চিত্রায়িত করা হয়েছে। ব্লাউজের ব্যবহার তখনও করা হয়নি। তবে সব ছবিতেই নারী ছিল শাড়ি পরিহিতা।

পত্রিকায় অসংখ্য তেলের বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়েছিলো। সেসব বিজ্ঞাপনে নারীকে সবসময়ই চুল খোলা এবং ব্লাউজ বিহীনভাবে প্রকাশ করা হয়। সেখানে অনেক আধুনিক নারীচিত্রও দেখা যায় আবার সাধারণ নারীর ছবিও দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে অবশ্য ব্লাউজের ব্যবহার শুরু হয়। যেমন- **ফুলেলা** (৪ জুলাই ১৯২০), **কেশরঞ্জন তেল** (১ আগস্ট ১৯১৫), **গয়টার কিওর** গলগণ্ড রোগ, (১৫ এপ্রিল ১৯২৮), **বি, চন্দ্র এন্ড কোম্পানির লাবণ্য প্রভা তৈল** (৬ এপ্রিল ১৯০২) যেখানে নারী শাড়ির সাথে হাতাকাটা ব্লাউজ পরেছিল আর চুল ছিল খোলা। উদাহরণস্বরূপ :

[৫০]

ঢাকা প্রকাশ (২৫ জুলাই ১৯২০)

নারীচিত্রে কেশরঞ্জন তেলের বিজ্ঞাপন

ঢাকা প্রকাশ-এ প্রকাশিত ২৫ জুলাই ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের উপরিউক্ত ছবিতে নারীকে ব্লাউজসহ শাড়ি পরিহিতা অবস্থায় দেখা যায়। নারী মানেই তাকে লম্বা চুলে আকর্ষণীয় লাগবে এমনটাই প্রতিটি বিজ্ঞাপনেই বোঝানো হতো। কারণ লম্বা চুলের ব্যবহার শুধু তেলের বিজ্ঞাপনেই ছিল এমনটা নয়, সকল বিজ্ঞাপনেই ছিল একই চিত্র। সব নারীর হাতেই চুড়ি দেখা যায়। আবার বই হাতে নারীকে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখা যায়। খুব প্রশান্তি ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে ছবিটিতে। তবে শারীরিক গঠন বেশ আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

[৫০] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ জুলাই, ১৯২০ খ্রি., ঢাকা, ৯ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ৬০ ভাগ, ১৫শ সংখ্যা, পৃ. ১।

[৫১]

ঢাকা প্রকাশ (৬ এপ্রিল ১৯০২)

তেল হাতে আকর্ষণীয় নারীর ছবি

বি চন্দ্র এন্ড কোম্পানির লাবণ্যপ্রভা তেলের বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো পত্রিকায় বিভিন্ন সময়। চিত্রে নারীকে খুব আকর্ষণীয়ভাবে, হাতাকাটা ব্লাউজে প্রদর্শন করা হয়। খোলা লম্বা চুল কপালের কাছে আবার ছোট করে কাটা রয়েছে। আধুনিক নারীদেরও এই তেল পছন্দ এটা বোঝানোর জন্যই এমন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হতো।

পত্রিকার আরেকটি চিত্রে দেখা যায় চোখের মলমের বিজ্ঞাপনে নারীর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। চোখের মলমের বিজ্ঞাপনে নারীর ছবি দেয়ার কারণ কি হতে পারে? চেখের সমস্যা শুধু নারীদের হতো এমন তো নয়, তবুও এমন আকর্ষণীয়ভাবে নারীকে উপস্থাপন করা হতো। পত্রিকায় এমন অসংখ্য বিজ্ঞাপনচিত্রের ব্যবহার দেখা যায় যেখানে নারীর প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। ***ঢাকা প্রকাশের*** এমন আরেকটি বিজ্ঞাপনচিত্রে দেখা যায় ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ঔষধের বিজ্ঞাপনে নারীর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, যা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। কারণ ম্যারেরিয়া ও কালাজ্বর শুধুমাত্র নারীদের রোগ নয়। তবুও এখানে নারীর উপস্থিতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় বহন করছে।

পর্দা প্রথার যুগে নারীকে এমনভাবে উপস্থাপনের কারণ কি হতে পারে? হতে পারে অন্দরমহলের ভেতরের চিত্রটিই তুলে ধরা পত্রিকাটির একটি স্টাইল। তবে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্রই নারীর আসল চেহারা ফুটিয়ে তোলা তা নয়, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যও তাদের মধ্যে কাজ করেছিল। তাই তারা এভাবে নারীকে উপস্থাপন করেছিল। এমন আকর্ষণীয়ভাবে নারীকে উপস্থাপিত করায় পাঠকশ্রেণিও আকর্ষিত হতো পত্রিকা পাঠ করতে। প্রসাধনের প্রচার ও প্রসারে এবং ঔষধের ক্ষেত্রেও নারীকে এভাবে উপস্থাপন করা ছিল তাদের কাছে লাভজনক ব্যবসা। ঢাকার নারীর পোশাকে বেশ পরিবর্তন সূচিত হয়

[৫১] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ এপ্রিল, ১৯০২ খ্রি., ২ চৈত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪১ ভাগ, ৫২শ সংখ্যা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর হাত ধরে। কারণ শাড়ির নিচে নগ্ন বক্ষের কারণে তাকে ব্রিটিশ রাজের ক্লাবে ঢুকতে না দেয়া হলে তিনি ব্লাউজের প্রচলন শুরু করেন।[৫২]

১৯২০ সালের দিকে নারীদের শাড়ি নবরূপ গ্রহণ করে। নাম দেয়া হয় ব্রাহ্মিকা শাড়ি। যার সাথে থাকতো ব্লাউজ, পেটিকোট, জুতা ও জ্যাকেট।[৫৩] কিন্তু *ঢাকা প্রকাশের* ১৯২৮ সালের নারীর ছবি সংবলিত বিজ্ঞাপনেও নারীকে সেই আগের রূপেই দেখা যায়। শাড়ির এই আধুনিক রূপ হয়তো সর্বসাধারণের মাঝে তখনও স্বীকৃত বা বহুল ব্যবহৃত হয়নি।[৫৪] তবে ১৯ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের শুরুতে নারীরা যখন বিভিন্ন কারণে বাইরে যাওয়া শুরু করল তখন তারা শরীর ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বোরখা পরা শুরু করলেন। এটা তারা পোশাকের উপরে পরতেন। বোরখার সাথে ব্রুচও পরতে শুরু করলেন তারা।[৫৫] তখন নতুন নতুন পোশাকের আবির্ভাব হয়েছিল।

নারীরা তখন পোশাকের উপরে শালও পরতেন। *ঢাকা প্রকাশের* তথ্য থেকে এটি পরিষ্কার হয়েছে। কারণ পত্রিকাটি মেয়েদের শালের অনেক বিজ্ঞাপন দিয়েছে। *ঢাকা প্রকাশ* ৮ মাঘ, ১৩১৭ সংখ্যার ২ নং পৃষ্ঠার ৭ম কলামে **স্ত্রী লোকদিগের শাল** শিরোনামে ছোট পরিসরে এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছিল। কিন্তু শিরোনামটি ছিল বড় হরফে যেন সহজে এটি পাঠকের চোখে পড়ে। বর্ণনায় রয়েছে এটি অত্যন্ত সুন্দর। মূল্য ৯ টাকা থেকে ৪০ টাকা। চেক রেপার ৬, ৯ টাকা। কম্ফোর্টার ৩১৭০ টাকা। মলিদা চাদর ৬ টাকা। পোশাকের জন্য পটু ৯ টাকা, জালালপুরী ধোসা ১০ টাকা। ঠিকানা দেয়া ছিল 'আমীর চাঁদ এন্ড সন্স, লাহোর'। এই সংখ্যার শেষের কলামে মহিলাদের জন্য অনেকগুলো বিজ্ঞাপন ছিল। তার মধ্যে **লাহোরী ধোসা** অন্যতম। এটা ছিল এক ধরনের পোশাক। এটি অত্যন্ত গরম এবং কোমর ৬ গজ দীর্ঘ, ৫৮ ইঞ্চি প্রস্থ, মূল্য ২৬ টাকা। ৩ গজের মূল্য ১৩ টাকা।[৫৬] তখনকার ঢাকার নারীরা আসামজাত বিশুদ্ধ এন্ডি ও মুগা কাপড়ও পরিধান করতো।

নারীদের প্রসাধনের আরেকটি অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে হাতের চুড়ি। নারীর সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয় হাতের বালার মাধ্যমে। সকল শ্রেণির নারীরাই তখন হাতে চুড়ি পরতো। স্বদেশি আন্দোলনের সময় নারীরা প্রতিবাদস্বরূপ তাদের হাতের চুড়ি ভেঙে ফেলেন। তারা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কতটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে তারা নিজেদের হাতের চুড়ি ভেঙে ফেলেন। নারীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য সে সময় *ঢাকা প্রকাশে* **স্বদেশি চুড়ির** বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে নানাবিধ চুড়ি আমদানি

---

[৫২] https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/kowshik78/30314555

[৫৩] আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, বাংলা একাডেমি অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ১০৩।

[৫৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ২ বৈশাখ, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ১৫ এপ্রিল, ১৯২৮ খ্রি., ৬৮ ভাগ, ১ম সংখ্যা, কলাম-৩য়, পৃ. ৭।

[৫৫] আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, বাংলা একাডেমি, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ১০১।

[৫৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ৮ মাঘ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ২২ জানুয়ারি, ১৯১১ খ্রি., ঢাকা, ৫০ ভাগ, ৩৬ শ সংখ্যা, কলাম-৭ম, পৃ. ২।

করা হতো। ভদ্রমহিলাদের জন্য ডাম্বল এবং শামসেতারা চুড়ি আনয়ন করা হতো সে সময়। ঢাকার এজেন্ট ছিল শ্রী মদনমোহন কেশব লাল দাস।[৫৭]

তৎকালীন সময় নারীরা ঘরের মধ্যে থাকলেও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতাও তৈরি হয়ে যায় বঙ্গভঙ্গের কিছুকাল পূর্ব থেকেই এবং *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় নারীদের সেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছে বিভিন্ন সময়।

৪. রাজনীতিতে নারী

রাজনীতি সার্বিক সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক একটি উপাদান। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমেরও এক অবধারিত অঙ্গসংগঠন এটি। অতীতে এতে শুধু পুরুষের একক আধিপত্য থাকলেও ধীরে ধীরে নারীরাও এতে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ইতিহাসের পাতায় এক বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। মূলত এর মাধ্যমেই স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। স্বদেশি অর্থ নিজ দেশীয় এবং বয়কট অর্থ বর্জন করা। এখানে স্বদেশি আন্দোলনটি হয়েছিল ব্রিটিশদের পণ্যের বদলে নিজ দেশের পণ্য গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আর বয়কট আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের মাধ্যমে তাদের সমগ্র অর্থনীতিকে ভেঙে দেওয়া।[৫৮] এ আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি তৎকালীন নারীসমাজের এক বিশাল অংশের সম্পৃক্ততা দেখা যায়। সে সময় নারীরা বন্দি ছিল পর্দা প্রথার বেড়াজালে তা সত্ত্বেও এত নারীর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি সত্যিই অনেক অকল্পনীয়। এক্ষেত্রে নারীদেরকে অংশগ্রহণের জন্য পুরুষরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের দ্বারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং প্রভাবিত ছিল, আর এই বিষয়টিতেও তারা তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

যুগ যুগ ধরে অবহেলিত নারীসমাজ নিজেদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে শুরু করলো যখন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাকে শুধু নারী হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে রাজনীতিতে তাদের ভূমিকার কথা বোঝাতে সক্ষম হলো। পুরুষরা বুঝতে পেরেছিল যে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ অর্থাৎ নারীদেরকে ছাড়া এই আন্দোলন সফল হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এটি এমন আন্দোলন ছিল যে, যেসকল পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য গ্রহণ করতে হবে সেসব নিত্য ব্যবহার্য পণ্য নারীরাই বেশি ব্যবহার করে। তাই আগে ঘর ঠিক না করলে বাইরের আন্দোলন যে সফল হবে না সেটি ছিল পরিষ্কার। তারা তাদের আন্দোলন

---

[৫৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ শ্রাবন, রবিবার, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ৪৭ ভাগ, ১৮শ সংখ্যা, ১ম কলাম, পৃ. ৭.

[৫৮] রুপালী খাতুন, 'স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বাঙালি নারী', জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস, ভলিউম, ১০, নং- ১, জানুয়ারি - জুন, ২০২০, পৃ. ১।

সফল করার উদ্দেশ্যে নারীদেরকেও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। আর গৃহবন্দি অবস্থা থেকে হঠাৎ করে নারীরা ঘরের বাইরে বের হতে পেরে নিজেদেরকে মুক্ত ভাবতে শেখে। নারীরা পরিবারের পুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনে যোগ দিলেও বেশিরভাগ নারীরাই নিজের ইচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে স্বদেশের প্রতি মমতা, ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা এবং দীর্ঘদিনের অবরোধ প্রথা ভেঙে মুক্তির স্বাদ অন্বেষণ এ সবকিছুই কাজ করেছিল। আর এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সভা সমিতিতে তাদের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি দেখে। যেসব এলাকার নারীরা সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে বলে *ঢাকা প্রকাশ* মন্তব্য প্রকাশ করেছে সেসব অঞ্চলগুলো হলো মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রংপুর, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, বরিশাল ইত্যাদি। বিভিন্ন সভা সমাবেশে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। প্রথম থেকেই যে নারীরা নিজেরা এই সকল সভা সমাবেশের আয়োজন করতো তা নয়, পুরুষদের কর্তৃক আয়োজিত সভায় তারা শুরুর দিকে অংশগ্রহণ করতো তাও পর্দার আড়ালে বসে। জনসম্মুখে আসতে তাদের বেশ সময় লেগেছে। তারা সম্মুখে এসে পরবর্তীতে বিভিন্ন বক্তৃতাও প্রদান করেছে। যখন তারা তাদের মাধ্যমে নারীদেরকে প্রভাবিত করতে পেরেছে এবং তাদের উদাত্ত আহ্বানে অনেক নারী সরাসরি রাজনীতিতে আসার সাহস পেয়েছে এরপর থেকে নারীরা নিজেরাই এ সকল সভা সমিতির আয়োজন করতে শুরু করে বলে *ঢাকা প্রকাশ* থেকে জানা যায়।[৫৯] ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় *অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস* যা ছিল হিন্দুদের একটি প্রতিষ্ঠান। পুরুষরা দলে দলে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি নারীরাও এই সংগঠনে যোগ দিতে থাকে। তারমধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী দেবী অন্যতম।

[৬০]

স্বর্ণকুমারী দেবী (২৮ আগস্ট, ১৮৫৫ - ৩ জুলাই ১৯৩২, প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক)

পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আরো অনেক নারী সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলা দেবী এ দেশের নারীদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য সর্বদা কাজ করে গিয়েছেন। তার

[৫৯] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক(২০০১), *আমি নারী, তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস (১৮-২০) শতক*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ৯৮।

[৬০] https://bn.banglapedia.org/images/1/1f/DeviSwarnaKumari.jpg

আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে হাজারো নারী তার মধ্যে শিশু থেকে বৃদ্ধা সকলেই ছিল। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন **লক্ষ্মীর ভান্ডার** যেখানে নারীদের ব্যবহৃত সকল দেশি জিনিস পাওয়া যেত।[৬১] তিনি ছিলেন নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস।

[৬২]

সরলা দেবী চৌধুরানী (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ – ১৮ আগস্ট ১৯৪৫)

সমসাময়িক পত্রপত্রিকাগুলোতেও নারীদের জেগে ওঠার জন্য প্রভাবিত করা হয়। সেখানে কবি সাহিত্যিকরাও নারীদেরকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানান। চারণ কবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪) গেয়েছিলেন:

'ও আমার বঙ্গনারী
পড়ো না বিলেতি শাড়ি
ভেঙে ফেলো বেরোয়ারি চুড়ি।'[৬৩]

তখন নারীরা কার আগে কে চুড়ি ভাঙবে তার প্রতিযোগিতায় নামে। তারা বিলেতি সকল ধরনের জিনিস স্পর্শ করা বন্ধ করে দেয়। এ সময় কাজী নজরুল ইসলামের 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গানটিও দারুণভাবে প্রভাবিত করে।[৬৪] এতকাল ধরে সমাজের উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীরা নিজেদেরকে ভাবতো পরিবারের বোঝাস্বরূপ, তাদের অংশগ্রহণে একটা আন্দোলন সফল হতে পারে এই আত্মোপলব্ধি তাদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অনেক আনন্দদায়ক করে তুলেছিল। এমনকি অনেক পুরুষের চেয়ে নারীরা এক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। হিন্দু নারীদের উপস্থিতি সর্বাগ্রে দেখা যায়। মুসলমান নারীরা তখনো শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারেনি। ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল তাদের সমর্থনের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যখন কোনো দেশে যুদ্ধ লাগে কেউ সরাসরি যুদ্ধ করে, আবার কেউ

---

[৬১] Bharati Roy, '*Swadeshi Movement and Womens Awakening in Bengal 1903-1910,*' Calcutta Historical Journal, Vol. X, N.2, 1985; ভারতী, কার্তিক, ১৩১১

[৬২] https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4tQWHYbt7hGsiPHpL6qjSUCg7PKeSLseqUbGU0u5RxsrrgTq9grNZAkB9wJjwczcGw3HfGC3RyF2Q1zByhlKEDA

[৬৩] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ. ৮২।

[৬৪] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ. ৮৩।

তাদেরকে সাহায্য করে, আবার অনেকে উপাসনার মাধ্যমে তাদের জন্য দোয়া করে, এক্ষেত্রে আসলে সবাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যোদ্ধা। তৎকালীন সময়ে মুসলমান নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ভূমিকাটাও ঠিক এমনই ছিল। বরিশালে সর্বপ্রথম নারীদের একক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উকিল নিবারণ চন্দ্র দাসের বাড়িতে এবং আমানত গঞ্জে প্যারীমোহনের বাসায় নারীদের একক দুটি সভার তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় নারীদের একক সভা সমাবেশের তথ্য উঠে এসেছে। বিক্রমপুরে এবং মানিকগঞ্জে ঘরের বাইরে গ্রামেও নারীদের উদ্যোগে একক নারী সভার আয়োজন করা হয়।[৬৫] মূলত শিক্ষিত নারীরা এসকল সমাবেশে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। কারণ তারা তাদের সুন্দর বক্তৃতার মাধ্যমে নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন এবং অভিজাত বা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বাসভবনে এ সকল সভার আয়োজন করা হতো।[৬৬]

কমলা দাশগুপ্ত তার স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৮) পৃ.২৭২ তে কয়েকজন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন। যথা: সুশীলা সেন, কমল কামিনী গুপ্তা, গিরিজা গুপ্তা, সুরমা সেন, মুক্তকেশী দেবী, নবশশী দেবী, চিন্ময়ী দাস প্রমুখ।[৬৭] কোথাও কোনো মুসলমান নারীর নাম প্রত্যক্ষ ভূমিকায় দেখা যায় না। *ঢাকা প্রকাশ* থেকে জানা যায় এই আন্দোলনের ফলে স্বদেশি অনেক পণ্য নিজ দেশে তৈরি করা শুরু হয় এবং নারীরা চরকা কিনে তাতে সুতা কাটা শুরু করে। একাজে নারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সত্যতা পাওয়া যায়।[৬৮] নারীরা চরকা কিনে তা অন্য দুঃস্থ নারীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণও করেছিলেন। সুশীলা সুন্দরী গুপ্তা নামক নারী মানিকগঞ্জের নারীদের মধ্যে চরকায় সুতা প্রস্তুতির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অন্দরমহলের সাধারণ নারী, ছোট বালিকা এবং বারবনিতাদেরও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি পণ্য ব্যবহারে দৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ হতে দেখা যায়। বালিকারা অংশগ্রহণ করতো সভা-সমাবেশে স্বদেশি সংগীত বা কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। তখন বালিকারা এমন অনেক পণ্য ই ফিরিয়ে দিয়েছিল, যা তারা স্কুল থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল। কারণ হিসেবে জানা যায় সেগুলো বিলাতি পণ্য ছিল।

শুধু সাধারণ নারী বা ছোট বালিকাই নয় আরেক শ্রেণির নারীও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, যারা সমাজে বারবনিতা পেশার সাথে যুক্ত ছিল। বিলাতি দ্রব্য সম্পর্কে তারা কঠোর অবস্থান নিয়েছিল। এমনকি বিলাতি মদ নিয়েও তাদের কক্ষে প্রবেশ করা যাবে না বলে তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। *ঢাকা প্রকাশের* এই সকল রিপোর্ট থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, নারীরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কেউ

---

[৬৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯ মাঘ, ১৩১৩,পৃ. ৩।

[৬৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ কার্তিক, ১৩১৩, পৃ. ৪।

[৬৭] কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৭২।

[৬৮] *ঢাকা প্রকাশ*, সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯০৫, পৃ. ৯।

প্রকাশ্যভাবে এবং কেউ অপ্রকাশ্যভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সকল খবরগুলোই পত্রিকাটি গুরুত্বের সাথে প্রচার করেছিল। পত্রিকার সম্পাদক মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী একজন সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও নারীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়টি পত্রিকায় ইতিবাচকভাবে তুলে ধরেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় নারীরা আন্দোলনে নামছে শুনেও সেটার পক্ষেই পত্রিকাটির অবস্থান ছিল।

এ আন্দোলনের ফলে নারীদের মাঝে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়। তারা ঘরের বাইরেও যে এত বিশাল জগৎ আছে সে সম্পর্কে সজাগ হয় এবং পায় মুক্তির আনন্দ। দীর্ঘদিনের যে অবরোধ প্রথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল সেই প্রথার শিথিলতা আসে নারীদের জীবনে। কারণ পুরুষরাই তাদের আন্দোলন সফল করার জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে নারীকে বাইরে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। তবে সহজেই উপলব্ধি করা যায় নারীদেরকে অংশগ্রহণ করানো ছাড়া কোনো উপায়ও তাদের ছিল না।

ঢাকা প্রকাশ নারীদের এই সকল খবরগুলো খুবই ইতিবাচকভাবে তুলে ধরেছিল। নারীদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের জন্য পত্রিকাটির এমন ইতিবাচক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা শুধু স্বদেশি আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা নিয়েই না পরবর্তীতে অহিংস আন্দোলন, দেশ বিভাগ পরবর্তী ভাষা আন্দোলনেও নারীদের সম্পৃক্ততার খবরসমূহ তুলে ধরেছিল।

১৯৪৭ সালের ভারত পাকিস্তানের বিভাজন নারীর শুধু রাজনৈতিক জীবনই নয় গোটা জীবনকেই ওলটপালট করে দিয়েছিল। এমনকি সমগ্র সমাজই ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল, আর এই সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ও অবহেলিত হয়েছিল নারীরা। দেশ বিভাগের কারণে প্রচুর নারীর অভিবাসন ঘটেছিল। তখন পাকিস্তানে যায় মুসলমান নারীরা আর ভারতে যায় হিন্দু নারীরা। এক দেশ থেকে আরেক দেশে অভিবাসনের ফলে নারীরা শিকার হয় ধর্ষণ এবং খুনের মতো নৃশংস ঘটনার এবং অসংখ্য নারীরা এই অত্যাচারের ভয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।[৬৯] *ঢাকা প্রকাশ* থেকে এসময় প্রচুর নারীর আত্মহত্যার খবর পাওয়া যায়। বিভাজনের কিছুকাল পরে স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক, শিক্ষাগত এমনকি নানা বিষয়ে নারীরা এগিয়ে আসার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছিল। এমন ধরনের প্রয়াস আগেও হয়েছিল, বর্তমানেও আছে, এমনকি ভবিষ্যতেও এই প্রয়াস চলতে থাকবে।

পাকিস্তান মহিলা সম্মেলন

ঢাকা প্রকাশের আরেকটি প্রতিবেদন থেকে **পাকিস্তান মহিলা সম্মেলন** শিরোনামে নারীদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের আরো তথ্য পাওয়া যায়।

[৬৯] পুতুল সাউ এবং করবী মিত্র, *নারী স্বাধীনতার সময় ও স্বাধীনতার পরে*, BKGC SCOLARS, January-June 2021, Vol.2, Issue 1, p. 90.

সাহেব প্রণীত
মূল্য—১॥০ টাকা মাত্র
এজেন্ট, রশিদীয়া লাইব্রেরী
৫৭।৫, ইসলামপুর, ঢাকা

৯১ বর্ষ ৪৮শ সংখ্যা] ২৪শে চৈত্র, রবি

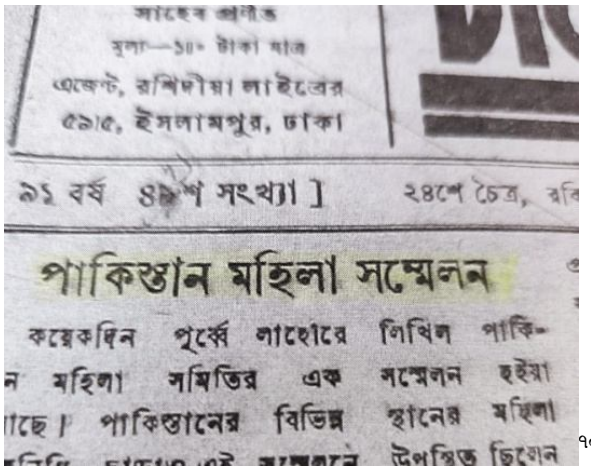

পাকিস্তান মহিলা সম্মেলন

কয়েকদিন পূর্ব্বে লাহোরে নিখিল পাকি-
ন মহিলা সমিতির এক সম্মেলন হইয়া
াছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানের মহিলা
উপস্থিত ছিলেন [৭০]

ঢাকা প্রকাশ (৬ এপ্রিল ১৯৫২)

পাকিস্তানের লাহোরে নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন হয়েছিল। যেখানে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানের মহিলা প্রতিনিধি ছাড়াও ছিল ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, মিশর, লেবানন, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ। ৫ দিনব্যাপী এই সম্মেলন চলেছিল। এতে প্রতিনিধি ও দর্শক মিলে প্রায় পাঁচশত মহিলা যোগদান করে। পাকিস্তান ও ভারতীয় উপমহাদেশে এটাই ছিল সর্বপ্রথম অনেক বড় মহিলা সম্মেলন। এরূপ বড় ও ব্যাপকভাবে আর কোনো মহিলা সম্মেলন পাক ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায় না। বেগম লিয়াকত আলী খান এই সম্মেলন আহ্বান করেন এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ এর উদ্বোধন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই পাকিস্তান মহিলা সমিতির জন্ম হয় এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ ভালোভাবেই গড়ে ওঠে। এর শাখা পাকিস্তানে স্থাপিত হয়েছিল এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও দেশের কাজে মহিলাদের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত বলে মত প্রকাশ করেছিল এবং হয়তো পৃথিবীর সকল দেশের নারীরা সদস্য হয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিল। এ মহিলা সমিতির লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর সমস্ত নারী জাতির সমস্যা সমাধান করা, সমাজ গঠন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা এবং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা।

পৃথিবীর শান্তি হয়তো এই সমিতির চেষ্টায় ফিরিয়ে আনা যাবে 'কে বলতে পারে' এভাবেই সমিতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছিল। এই সমিতির সকলেই ছিলেন মুসলিম দেশের মুসলিম নারী সদস্যবৃন্দ। পুরুষরাও তাদেরকে সহায়তা করেছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ পাকিস্তানের লাহোরে নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনের আহ্বান বেগম লিয়াকত আলী খান করলেও এর উদ্বোধন করেছিলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ। পাকিস্তান জন্ম লাভের পর পাকিস্তানের এই মহিলা সমিতি

[৭০] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ এপ্রিল, ১৯৫২ খ্রি., ২ চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ৯১ বর্ষ, ৪৮ শ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর মর্যাদা, নারীর সমতা ও নারীর স্থান নির্দেশ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলনের ঐতিহাসিক দিক ছিল। যদিও এই সম্মেলনে শুধুমাত্র মুসলিম দেশসমূহের মহিলা প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু এটা ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে বলে আশা করা হয়েছিল।

৫. নারী শিক্ষা

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। প্রকাশনার শুরুর বছর থেকে ভারত ও পাকিস্তান দেশ বিভাগের বহু বছর পর পর্যন্তও পত্রিকাটি স্বগৌরবে টিকে ছিল। পত্রিকাটি তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রকাশিত এইসব প্রবন্ধে নারী বিষয়ক ভাবনা ও প্রাধান্য পায় সমান তালে। *ঢাকা প্রকাশে* নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নারী শিক্ষা, বাল্য বিয়ে, বিধবা বিয়ে, নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। এজন্য *ঢাকা প্রকাশের* আলোকে তৎকালীন সময়ে ঢাকার নারীদের সামগ্রিক জীবনের পাশাপাশি শিক্ষা প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করা যায় অনায়াসেই।

ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং প্রতিবেদন থেকে নারী শিক্ষা সম্বন্ধে সমকালীন ভাবনা, নারী শিক্ষার উন্নয়নে কি কি বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, নারীর কোন ধরনের শিক্ষা অর্থাৎ গৃহশিক্ষা নাকি পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, নারী শিক্ষা উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা এবং শিক্ষিত নারীদের বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পত্রিকায় কিভাবে তুলে ধরা হয়েছিল, কি ধরনের ট্রেনিং বা লেখাপড়া নারীদের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, নারী শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা এবং নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে অন্তরায়সমূহ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পরে। নারীকে শিক্ষিত হওয়ার জন্য সমাজের অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। বাল্য বিবাহের কারণে আট, দশ বছরের বেশি সময় পিতৃগৃহে থাকতেই পারতো না তারা, আর সমাজ বলতো নারী শিক্ষিত হলে সে বিধবা হয়ে যায়। এই ধরনের বেড়াজালে আটকে থাকা সমাজে স্বামীর বাড়ি গিয়ে নারীর শিক্ষাগ্রহণ অসম্ভবপর বিষয় ছিল সে সময়। নারীর শিক্ষা দরকার স্বামীর গৃহে সুন্দরভাবে সংসার করার জন্য যা যা প্রয়োজন সেই বিষয়ে , তার বাইরে যদিওবা শিক্ষা লাভ করতে হয় তা হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা যার ভিত্তি গৃহেই শেখানো হতো, এমন ধারণাই সমাজের সকল মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল।[৭১]

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা নারী শিক্ষার অনুকূলে এবং সময়ের বিবর্তনে প্রতিকূলেও মত প্রকাশ করে। তবে তারা নারীকে সম্মান করে ভালো ভালো শব্দ চয়ন করে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, নারী মাত্রই

[৭১] আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

গৃহেই সুন্দর। শারীরিক অবকাঠামোগতভাবে তারা পুরুষদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান হতে চাওয়াটা তাদের উচিত না। এমনকি নারীরা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়েও মেধার পরিচয় দিতে পারবে হয়তো কিন্তু তা তাদের সংসার জীবনে কোনো সুখ বয়ে আনবে না। বেশি শিক্ষিত মেয়েরা সংসারে অশান্তির কারণ হবে বলে জোরালো মত প্রচার করা হয়েছিল ।

উদাহরণ হিসেবে *ঢাকা প্রকাশ* উল্লেখ করে যে, কঞ্চি অবস্থায় কোনো বাঁশকে যত সহজে বাঁকা করা যায় তা পরিপক্ক বাঁশ হয়ে গেলে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা তার স্বামীর ঘরেই সম্পন্ন হয়। আর বিয়ের আগে বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। স্বামীর ঘরে গিয়ে কি করে স্বামীকে দেবতার রূপে গণ্য করতে হয়, শাশুড়ির মন জুগিয়ে চলতে হয়, কিভাবে নিজেকে মাতৃরূপে গড়ে তুলতে হয়, কিভাবে অন্যের ঘরকে আপন করে সারা জীবন নিজের সুখকে উৎসর্গ করতে হয়, এটাই নারী জাতির প্রকৃত শিক্ষা হওয়া উচিত। যে যত সুন্দরভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে সে যত সফল নারী রূপে গড়ে উঠবে।

নারী জাতির উচ্চশিক্ষা

এই রিপোর্টটি ২৪ ভাদ্র, ১৩১৪ সংখ্যায় **নারী জাতির উচ্চশিক্ষা** শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায়। এ সময় পত্রিকার স্বত্ব ছিল শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী এবং বাবু রাধারমন ঘোষ (বি. এ) এর হাতে। তারা ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু মনোভাবের। স্ত্রী শিক্ষার একেবারে বিপক্ষে সেসময় তাদের মত প্রকাশিত হয় পত্রিকার মাধ্যমে।

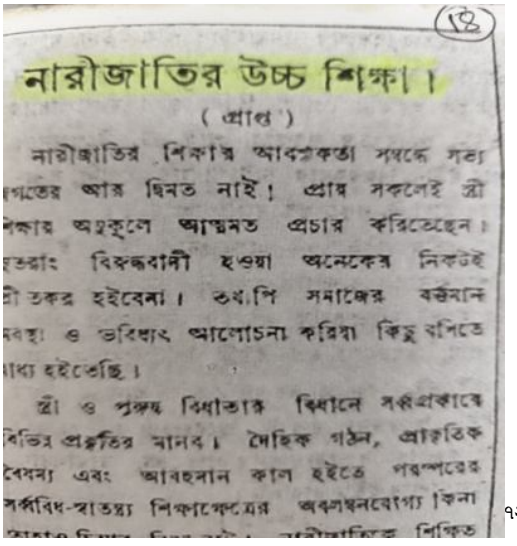

নারীজাতির উচ্চ শিক্ষা।

(প্রাপ্ত)

নারীজাতির শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সভ্য জগতের আর দ্বিমত নাই। প্রায় সকলেই স্ত্রী শিক্ষার অনুকূলে আত্মমত প্রচার করিতেছেন। সুতরাং বিরুদ্ধবাদী হওয়া অনেকের নিকটই শ্রীতিকর হইবেনা। তথাপি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করিয়া কিছু বলিতে বাধ্য হইতেছি।

স্ত্রী ও পুরুষ বিধাতার বিধানে সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্ন প্রকৃতির মানব। দৈহিক গঠন, প্রাকৃতিক বৈষম্য এবং আবহমান কাল হইতে পরস্পরের সর্ব্ববিধ-স্বাতন্ত্র্য শিক্ষাক্ষেত্রের অবলম্বনযোগ্য কিনা

[৭২]

ঢাকা প্রকাশ (১০ সেপ্টেম্বর ১৯১১)

[৭২] *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১১ খ্রি., ঢাকা, ২৪ ভাদ্র, রবিবার, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ৫১ ভাগ, পৃ. ৫।

তবে পত্রিকায় নারীশিক্ষার বিষয়ে অনেক ইতিবাচক বক্তব্যও উপস্থাপিত হয়। মত ভিন্নতা থাকলেও এটা স্পষ্ট যে (১৮৬১-১৯৫৯) কালপর্বে বাঙালি সমাজে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল। তবে প্রয়োজন অনুভূত হলেও পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে নারীদের শিক্ষাকে কেউ মেনে নেননি। বরং যারা ইতিবাচক ছিলেন তাদের বেশিরভাগই নারীদের সংসার পরিচালনা ও সন্তান পালনের শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন মাত্র।[৭৩]

বৃত্তিপ্রাপ্ত বালিকাদের সংবাদ প্রচার

ঢাকা প্রকাশের প্রতিবেদন থেকে নারী শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা সম্পর্কেও জানা যায়। অন্তঃপুর শিক্ষা থেকে বের হয়ে নারীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে শুরু করেছে এবং সরকার প্রদত্ত বালক ও বালিকাদেরকে ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে মাসিক ২ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল, যারা ১৯০১ সালের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। বৃত্তিপ্রাপ্ত বালিকারা ছিল- শ্রীমতি চপলা সুন্দরী দেবী (আলগি নি. প্রা.), লাবণ্য প্রভা (সিলমান্দি উ. প্রা.), মোক্ষদাবাসী (মৈলাদি নি. প্রা.), রূপিনী (হোসনাবাদ নি. প্রা.), স্নেহলতা সেন (সোনারঙ্গ নি. প্রা.), এনাগমেজা (বান্দুরা নি. প্রা.)।

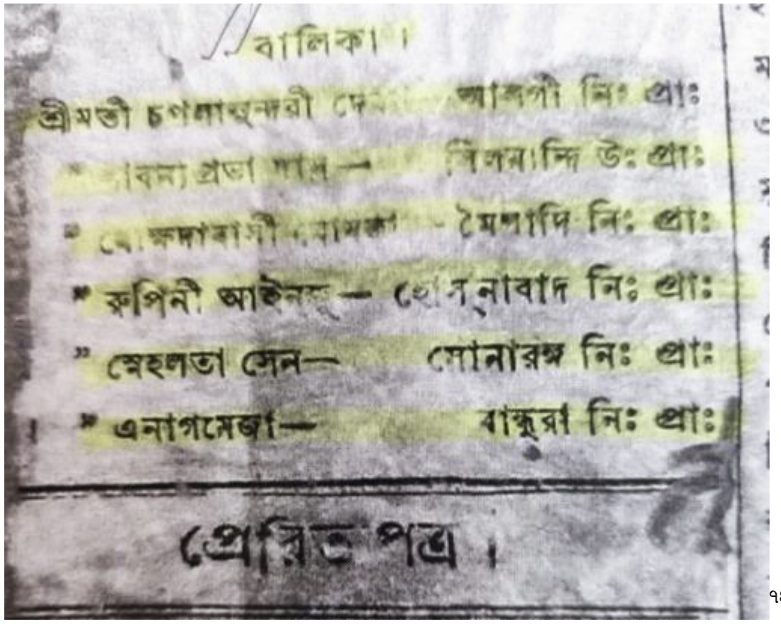

বালিকা।
শ্রীমতী চপলাসুন্দরী দে... আলগী নিঃ প্রাঃ
" লাবন্য প্রভা ... সিলমান্দি উঃ প্রাঃ
" মোক্ষদাবাসী ... মৈলাদি নিঃ প্রাঃ
" রূপিনী আইন... — হোসনাবাদ নিঃ প্রাঃ
" স্নেহলতা সেন— সোনারঙ্গ নিঃ প্রাঃ
" এনাগমেজা— বান্দুরা নিঃ প্রাঃ

প্রেরিত পত্র।

[৭৪]

ঢাকা প্রকাশ (৬ এপ্রিল ১৯০২)

পত্রিকা থেকে দেখা যায় শুধুমাত্র হিন্দু নারীরাই বৃত্তি পেয়েছে। মুসলমান নারীর চেয়ে হিন্দু নারীরা আগে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করে। মুসলমান নারীদের মধ্যে তখনও শুধুমাত্র আরবি শেখার উপরেই জোর দেওয়া হতো। এ ধারণা থেকে বের হতে তাদের কিছুকাল সময় লেগেছিল।

---

[৭৩] *ঢাকা প্রকাশ*, সেপ্টেম্বর ১০, ১৯১১ খ্রি., ঢাকা, ২৪ ভাদ্র, রবিবার, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ৫১ ভাগ, পৃ. ৫।

[৭৪] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ এপ্রিল, ১৯০২ খ্রি., ২ চৈত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪১ ভাগ, ৫২শ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

ইডেন ফিমেল স্কুল

ঢাকা প্রকাশের তথ্য থেকে জানা যায় পূর্ববঙ্গের একমাত্র উচ্চ শ্রেণির বালিকা বিদ্যালয় ছিল 'ইডেন ফিমেল স্কুল' এবং এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন একজন নারী এবং তাকে অনেক দক্ষ ও যোগ্য বলে পত্রিকাটি তথ্য প্রকাশ করে।

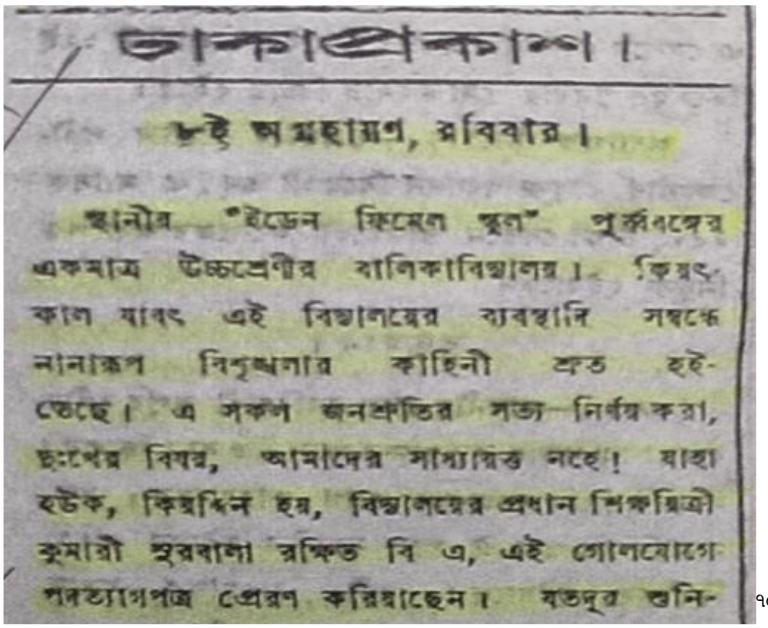

ঢাকাপ্রকাশ।

৮ই অগ্রহায়ণ, রবিবার।

স্থানীয় "ইডেন ফিমেল স্কুল" পূর্ব্ববঙ্গের একমাত্র উচ্চশ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয়। কিয়ৎকাল যাবৎ এই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে নানারূপ বিশৃঙ্খলার কাহিনী শ্রুত হইতেছে। এ সকল জনশ্রুতির সত্য নির্ণয় করা, দুঃখের বিষয়, আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে! যাহা হউক, কিয়দ্দিন হয়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী সুরবালা রক্ষিত বি এ, এই গোলযোগে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। যতদূর শুনি-

[৭৫]

ঢাকা প্রকাশ (১ ডিসেম্বর ১৯০৭)

ইডেন ফিমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কুমারী সুরবালা রক্ষিত বিদ্যালয়ে গোলযোগ দেখা দিলে পদত্যাগ করায় *ঢাকা প্রকাশ* দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং ১৫০ টাকা বেতনের চাকরিটা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন সেটা নিয়েও আফসোস করেছে। বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর যেন বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা করেন পত্রিকাটি সেই প্রত্যাশা করেছেন। এ তথ্য থেকে বোঝা যায় পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের বাইরে বের হয়ে চাকরি করার প্রতি বেশ ইতিবাচক ছিল এসময় এবং পত্রিকা থেকে আরও জানা যায় ঢাকাতে প্রায় ৩০০ মহিলা বাড়িতে বসে সরকারের নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রীগণের সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল। ঢাকার বাইরে বগুড়া এবং নোয়াখালীতেও এভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯১১ সাল হতে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাতেও অন্তঃপুর শ্রেণি খোলা হবে বলে জানা যায়।

[৭৫] *ঢাকা প্রকাশ*, ১ ডিসেম্বর, ১৯০৭ খ্রি., ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪৭ ভাগ, ৩০শ সংখ্যা, কলাম, ১ম, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

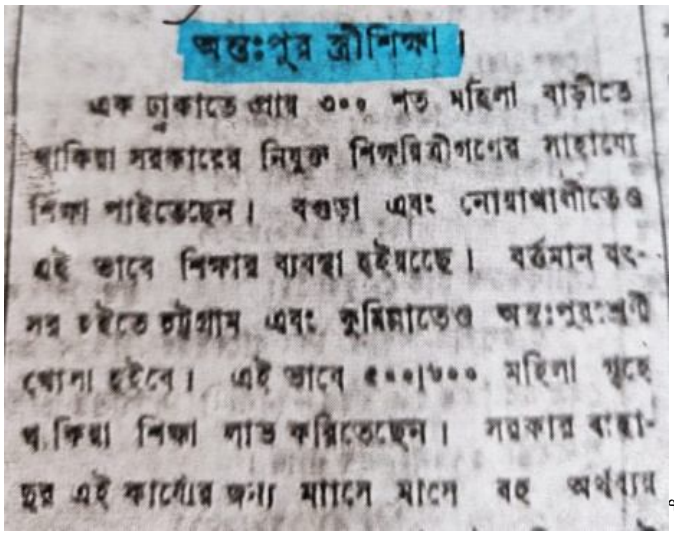

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা।

এক ঢাকাতে প্রায় ৩০০ শত মহিলা বাড়ীতে থাকিয়া সরকারের নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রীগণের সাহায্যে শিক্ষা পাইতেছেন। বগুড়া এবং নোয়াখালীতেও এই ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসর হইতে চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লাতেও অন্তঃপুর-শ্রেণী খোলা হইবে। এই ভাবে ৫০০।৬০০ মহিলা গৃহে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছেন। সরকার বাহাদুর এই কার্য্যের জন্য মাসে মাসে বহু অর্থব্যয়

[৭৬]

ঢাকা প্রকাশ (২৩ জুলাই, ১৯১১)

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা

রিপোর্টে বলা হয়েছে ৫০০ থেকে ৬০০ মহিলা গৃহে বসে সরকারি সহায়তায় শিক্ষা লাভ করেছিল। সরকার বাহাদুর নারী শিক্ষাদানে এরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। স্থানীয় সাহায্য পেলে প্রতিটি শহরেই এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে সরকার মত ব্যক্ত করেন। তখনো মধ্য ইংরেজি এবং মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। ঢাকা ও চট্টগ্রামে এমন ৪/৫ টা বিদ্যালয় ছিল। রাজশাহী বিভাগে কেবল বগুড়াতে একটা মধ্য বাংলা বিদ্যালয় ছিল। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সে সময় সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল রাজশাহী। স্ত্রী শিক্ষা সমিতি সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন সরকার যেন রাজশাহীতে স্ত্রী শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেন। তথায় একটা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় একান্ত প্রয়োজন বলে মতামত দেন। নিম্ন শিক্ষার জন্যও স্থানে স্থানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। পুরানো বিদ্যালয়গুলোকে উন্নত করার চেষ্টা করা হয়েছিল তখন। কোনো কোনো স্থানে বিদ্যালয়েগুলোকে সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত করে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কুমারী সরোজিনী দাস (বি.এ) ঢাকার বিদ্যালয়গুলোকে উন্নত করতে বিশেষ যত্ন করেছিলেন। উক্ত বছর (১৯১১) হতে মেয়েদের জন্য নিম্ন মধ্য শিক্ষা বিভাগে ১০০টা বিশেষ বৃত্তি রাখা হয়েছিল, এই প্রদেশ থেকে যারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তারা প্রায় সকলেই সরকারি বৃত্তি নিয়ে কলেজে পড়তে পারতো। সরকার এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মেয়েদের বিশেষ বৃত্তি দিয়ে কলেজে পড়বার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ঢাকা প্রকাশের রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। এই লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছিল স্ত্রী শিক্ষা কমিটি। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাননীয় মি. আর নাথান।

[৭৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ শে জুলাই, ১৯১১, ঢাকা, ৭ ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩১৮, ৫১ ভাগ, ২৫৭ সংখ্যা, পৃ, ৫

পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা।

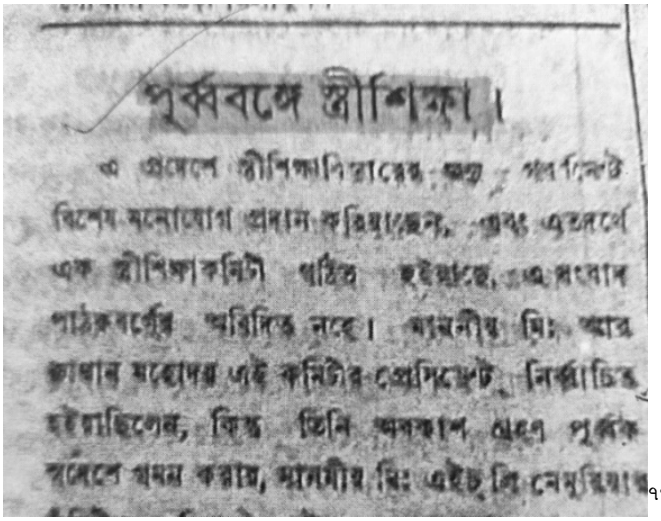

এ প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য গবর্ণমেন্ট বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, এবং এতদর্থে এক স্ত্রীশিক্ষা কমিটী গঠিত হইয়াছে, এ সংবাদ পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। মাননীয় মিঃ আর ন্যাথান মহোদয় এই কমিটীর প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অবকাশ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করায়, মাননীয় মিঃ এইচ, জি, [illegible][৭৭]

ঢাকা প্রকাশ (২৩ জুলাই ১৯১১)

পূর্ববঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে তিনটি উচ্চ শ্রেণির বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। ঢাকা ইডেন স্কুল, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রামেও স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। তখন শিক্ষয়িত্রী দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পাঠ পরিচালিত হতো। এগুলোকে আদর্শ স্কুল রূপে গড়ে তোলার জন্য সরকার অনেক অনুদান দিয়েছিল। এই স্কুলগুলোতে ছাত্রীদের জন্য ছিল হোস্টেলের ব্যবস্থা এবং সেখানে যথেষ্ট ছাত্রী বাস করতো। সে সময় ছাত্রীরা ১০-১৫ টাকা বৃত্তিও পেত। এখান থেকে প্রতিবছর ১০/১২ জন শিক্ষিকাও প্রস্তুত হতো ।

ময়মনসিংহ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৫০ জন। এর কার্যক্রম অত্যন্ত সুন্দরভাবে চলেছিল বলে জানা যায়। এর সাথেও ছাত্রীদের হোস্টেল ছিল। সেই হোস্টেলে ২০ থেকে ২২ জন ছাত্রী ছিল তখন। অনেকেই এই বিদ্যালয়ে অনুদানের টাকা পাঠাত। এর সাথে যদি আরো ছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে হয়তো অনেক বেশি ছাত্রী ভর্তি হতে পারতো বলে মত প্রকাশ করেছে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা। এ সকল খবর থেকে তৎকালীন সময়ের নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পাওয়া যায়। নারীদের উচ্চ শিক্ষার পক্ষে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়। নারীদের ঘরের বাইরে যেয়ে হোস্টেলে থেকে পড়ালেখা করাকে *ঢাকা প্রকাশ* ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করেছে। নারীরা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি অনুদান দেওয়া হচ্ছে, হোস্টেল নির্মাণ হচ্ছে, বর্ধিতকরণ হচ্ছে এ সকল কিছুই নারী শিক্ষার অনুকূলের সংবাদ পরিবেশন বলে ধারণা পাওয়া যায়।[৭৮]

---

[৭৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ জুলাই, ১৯১১ খ্রি., ঢাকা, ৭ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ৫১ ভাগ, ২৫৭ সংখ্যা, পৃ. ৫।

[৭৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ শে জুলাই, ১৯১১ খ্রি., ঢাকা, ৭ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ৫১ ভাগ, ২৫৭ সংখ্যা, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা প্রকাশের ১৩ ফাল্গুন ১৩১৮ সংখ্যায় **পাশ্চাত্য স্ত্রী শিক্ষা** শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

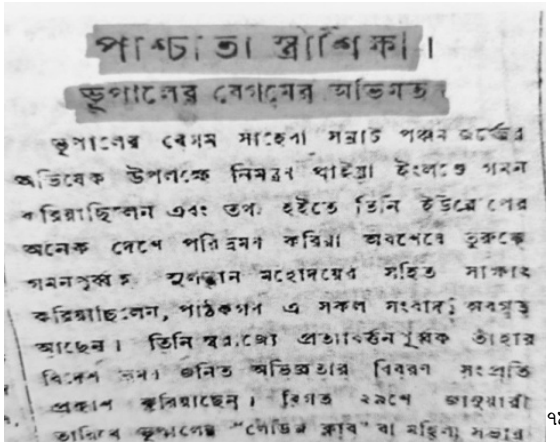

পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষা।

ভূপালের বেগমের অভিমত

ভূপালের বেগম সাহেবা সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পাইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তিনি ইউরোপের অনেক দেশে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে তুরুস্কে গমনপূর্ব্বক সুলতান মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, পাঠকগণ এ সকল সংবাদ অবগত আছেন। তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার বিদেশ ভ্রমণ জনিত অভিজ্ঞতার বিবরণ সংপ্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিগত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে ভূপালের "লেডিজ ক্লাব" বা মহিলা সভার

[৭৯]

ঢাকা প্রকাশ (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২)

পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষা

পত্রিকায় পাশ্চাত্যের মতো এদেশের নারীদেরও অবাধ স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়। আসলে ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও স্বাধীনতা দিয়েছে তা চর্চিত হলে এদেশের নারীরাও অনেক শিক্ষিত ও স্বাধীন হবে। পরবর্তীকালে নারীদের শিক্ষার পাশাপাশি শরীর চর্চা বিষয়ে ট্রেনিংয়েরও ব্যবস্থা করা হয়। *ঢাকা প্রকাশের* ২৬ শ্রাবণ, ১৩৪৭ সংখ্যা থেকে এ তথ্য জানা যায়। এ সময় ২৫ জন শিক্ষক ট্রেনিং পেয়েছিলেন এবং তারা ছাত্রীদেরকেও নিয়মিত শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন।[৮০]

ঢাকার নারীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৭ সালে ঢাকা হয় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। মুসলমান অধ্যুষিত দেশ হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমান নারীদের বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিগত অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তখন নামাজি মেডিকেল ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ঘোষণা করা হয়। ২০ টাকা মূল্যের পাঁচটি বৃত্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। বৃত্তিগুলোর নাম ছিল মাওলানা মোঃ হামিদ মেমোরিয়াল, কে, বি আব্দুল আজিজ মেমোরিয়াল, বেগম রাবেয়া খাতুন মেমোরিয়াল, মোঃ ওয়াজিউদ্দিন মেমোরিয়াল, বেগম হাসিনা খাতুন মেমোরিয়াল।

এই বৃত্তিগুলো পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত ছিল– এর মধ্যে অন্যতম শর্ত ছিলো যে, কলেজের অধ্যক্ষের কাছ থেকে ছাত্রীকে সার্টিফিকেট নিতে হবে এই মর্মে যে, সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত করে অথবা বৃত্তি প্রাপ্ত হলে তা অবশ্যই পালন করবে।[৮১] এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, দেশ বিভাগের পরিবর্তন মুসলিম নারীদের শিক্ষা ক্ষেত্রকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। কারণ এমন বৃত্তি ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। এ সময় *ঢাকা প্রকাশে* একজন ইংরেজির লেকচারার পদে

[৭৯] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২ খ্রি., ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন, রবিবার, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ৫১ ভাগ, ০৫ সংখ্যা, পৃ. ৪।

[৮০] *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ আগস্ট, ১৯৪০ খ্রি., ২৬ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, ৮০ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, কলাম-৩য়, পৃ. ৪।

[৮১] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ এপ্রিল, ১৯৫০ খ্রি., ৩ বৈশাখ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ৯০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে জনৈক নারী এ পদের জন্য আবেদন করে এবং নিজেকে যোগ্য দাবি করে। সামাজিক অবস্থা তখন অনেকটাই নারীদের অনুকূলে ছিল, যে কারণে তারা এ সাহসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।[৮২] এ থেকে পত্রিকাটির একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। নারীদের শিক্ষকতায় এগিয়ে আসতে এমন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ক ছিল বলে মনে হয়।

ঢাকা প্রকাশে নারী বিষয়ক আরো অনেক ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতো। যেমন- ২৬ চৈত্র, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যার ৪ নং পৃষ্ঠায় **বিবাহ স্ত্রীশিক্ষা** এবং **স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে মনুর মত ও তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা** শিরোনাম একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

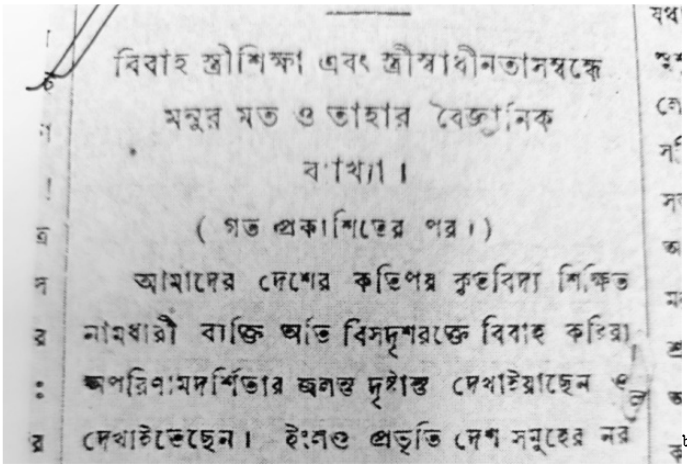

বিবাহ স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতাসম্বন্ধে
মনুর মত ও তাহার বৈজ্ঞানিক
ব্যাখ্যা।
(গত প্রকাশিতের পর।)
আমাদের দেশের কতিপয় কুতবিদ্য শিক্ষিত
নামধারী ব্যক্তি অতি বিসদৃশরক্তে বিবাহ করিয়া
অপরিণামদর্শিতার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ও
দেখাইতেছেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ সমূহের নর

[৮৩]

ঢাকা প্রকাশ (৭ এপ্রিল ১৮৮৯)

বিবাহ স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে মনুর মত

প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ছিল নিজের দেশের ছেলেরা বিলাতে কেমন করে সেখানকার নারীদেরকে বিয়ে করে সাংঘাতিক রকমের অন্যায় করছে। যা ধর্ম সমর্থন করে না বলে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। তাদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা হবে তাদেরকে খিচুড়ি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ দুটি মানুষের জীবন, পারিবারিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি ও অভিরুচি, খাদ্যাভ্যাস সব কিছুই আলাদা। তাই বিদেশে কেমন করে সেখানকার নারীদেরকে বিয়ে করলেই তা মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে পত্রিকাটি মত প্রকাশ করেছিল। এটা একেবারে ধর্মবিরুদ্ধ এবং নিন্দনীয় কাজ বলে প্রতিপন্ন ছিল সমাজের কাছে।

সংবাদ প্রতিবেদক সম্পর্কে

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় কারা সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করতেন এবং কারা প্রতিনিধি ছিলেন তাদের সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত

[৮২] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ এপ্রিল, ১৯৫২ খ্রি., ২৪ মে চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ৯১ বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা।

[৮৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ চৈত্র, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ১৮৮৯ খ্রি., ৭ এপ্রিল, ২৯শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, কলাম-২য় ও ৩য়, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় ১০০ বছর ধরে প্রকাশিত হলেও এ পত্রিকায় বর্তমানকালের পত্রিকার মতো সংবাদ প্রতিবেদকের নাম দেওয়া থাকতো না। সংবাদগুলো এমনভাবে থাকতো যে, আলাদা আলাদা সংবাদ খুঁজে বের করাই দুষ্কর ছিল এবং প্রতি সংখ্যাতে সম্পাদকের নাম উল্লেখ না থাকায় কার সময়ের পত্রিকা এটা বের করতেও বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। যে কয়জন সম্পাদকের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দীননাথ সেন, গোবিন্দ প্রসাদ রায় (সহকারী ছিলেন বৈকুণ্ঠ নাথ), অনাথ বন্ধু মৌলিক, যাদব চন্দ্র সেন, গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী, দীনেশ চরণ বসু, রাধারমন ঘোষ, মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী (তার সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্তী, পণ্ডিত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, নিশিকান্ত ঘোষ, উমেশ চন্দ্র বসু, হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়, মধুসূদন চৌধুরী এবং পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য)। সর্বশেষ সম্পাদক হিসেবে একজন মুসলমান সম্পাদকের নাম পাওয়া যায়, তার নাম আব্দুর রশিদ খান। তবে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের শুরু থেকে সম্পাদক হিসেবে নাম পাওয়া গেলেও পরের দিকে প্রকাশক হিসেবে নাম পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় পত্রিকা হেড কম্পোজিটর কর্তৃকও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিবেদকের পরিচয় না থাকলেও প্রেরিত পত্র থেকে কিছু নাম উদ্ধার করা গিয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কিছু পত্র পাঠিয়েছিলেন তারা। তখন সবাই নাম প্রকাশ না করলেও কেউ কেউ নাম প্রকাশ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে বংশ বদ; শ্রী গুরুচরণ সমাদর (সংবাদ প্রকাশের তারিখ ১৫ জুন, ১৮৮৪), শিক্ষিতার আক্ষেপ শিরোনামে শ্রীমতি শিক্ষিতা রায় নাম পাওয়া যায় (প্রকাশ ১১ নভেম্বর ১৮৯৪), ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩ বঙ্গাব্দ, জুন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। নাম ছিল শ্রী জগবন্ধু ভদ্র ও শ্রী আশুতোষ রায়, সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন শিরোনামে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে চিঠি পাঠান দুঃখী ব্রাহ্ম নামে। তারিখ ছিল (১১ ভাদ্র, ১২৭৩; ২৬ আগস্ট, ১৮৬৬)। ব্রাহ্ম আন্দোলন নিয়ে পত্র প্রকাশ করে ৪ শ্রাবণ, ১২৭৬ ; ১৮ জুলাই, ১৮৬৯ সালে আরেকজন ব্রাহ্মণ, যার নাম শ্রী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী।

ঢাকা প্রকাশে ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোৎসব পালন করা নিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। যেখানে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী (উপাচার্য) বঙ্গ চন্দ্র রায়, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, ভুবনমোহন সেন প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ ছিল ২০ ভাদ্র ১২৭৭ বঙ্গাব্দ; ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭০ খ্রি.।

পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ নামেও একজন ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়, যিনি পত্রিকায় ব্রাহ্ম ধর্ম বিষয়ক প্রস্তাব করে পত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই পত্রের ভিত্তিতে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টীগণ মত প্রকাশ করেন। পত্রিকা থেকে সেই ট্রস্টিবোর্ডে কারা ছিলেন তাদের নাম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। শ্রী কৈলাস চন্দ্র ঘোষ, শ্রী কালী প্রসন্ন ঘোষ, শ্রী দীননাথ সেন, শ্রী অক্ষয় কুমার দাস, শ্রী অভয় চন্দ্র দাস,

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী পার্বতী চরণ রায়, শ্রী ভগবান চন্দ্র বসু, শ্রী রাধিকা মোহন রায়, শ্রী দুর্গা মোহন দাস (পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের জনৈক ট্রাস্টি) । পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ (১০ আষাঢ়, ১২৭৯; ২৩ জুন, ১৮৭২)।

পত্রিকার পত্র প্রেরক হিসেবে আর একজন পূর্ব বাংলার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নাম পাওয়া যায়। তার নাম হচ্ছে শ্রী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ ২৬ ফাল্গুন, ১২৮৬ সাল)। পত্রিকার চিঠির মাধ্যমে আরও পত্র প্রেরকের নাম পাওয়া যায়। শ্রীকৈলাসচন্দ্র নন্দী (সম্পাদক, ঢাকা, উপাসকমণ্ডলী সভা, পত্রিকায় প্রকাশ-৯ চৈত্র ১২৮৬ বঙ্গাব্দ। শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ, (প্রকাশিত - ১৪ চৈত্র, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ), প্রেরিত পত্র থেকে আরো যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন চন্দ্র ঘোষ, শ্রী কালী প্রসন্ন ঘোষ, শ্রী অক্ষয় কুমার সেন, শ্রী অভয়চন্দ্র দাস, শ্রী পার্বতীচরণ, ভগবান চন্দ্র বসু, শ্রী রাধিকা, মহন রায় দাস (পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের জনৈক ট্রাস্টি), প্রকাশ- ১৪ জুন ১৮৭২। শ্রী কৈলাস চন্দ্র নন্দী, যিনি ঢাকা উপাসক মণ্ডলী সভার সম্পাদক ছিলেন। পত্র প্রকাশের তারিখ ছিল ২৬ চৈত্র, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ। পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবে শ্রী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-এর নাম পাওয়া যায়। পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ ৮ বৈশাখ, সোমবার, ১২৮৭। প্রেরিত পত্র থেকে শ্রী রজনীকান্ত ঘোষের নাম পাওয়া যায়। (২৮ বৈশাখ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ; ৯ মে ১৮৮০ খ্রি.)। প্রেরিত পত্র- বংশবদ, শ্রী অভয়চন্দ্র দাস, সভাপতি, শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক (পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ)। পত্র প্রকাশের তারিখ ছিল- ২৬ বৈশাখ, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ। তখন পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন শ্রী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি ছিলেন মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাস। শ্রী কৈলাসচন্দ্র নন্দী, উপাসকমণ্ডলী সভার সম্পাদক (প্রকাশ- ২১ আষাঢ় ১২৮৭ বঙ্গাব্দ; ৪ জুলাই ১৮৮০ খ্রি.) এবং বরিশাল ধর্মরক্ষিনী সভার কার্যাধ্যক্ষ হিসেবে শ্রী জয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (প্রকাশের তারিখ- ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ; ৩০ নভেম্বর ১৮৯০ খ্রি.)[৮৪], শ্রী উমেশচন্দ্র সিংহ (প্রেরিত পত্র, প্রকাশ- ৫ আগস্ট, ১৯০০)। পত্রিকায় প্রেরিত পত্রের নিচে সবসময় লেখা থাকতো প্রেরিতপত্রের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়, অর্থাৎ পত্রিকায় যারা চিঠি পাঠাতেন এই বিভাগে তাদের মতামতই প্রকাশ করা হতো। সেই মতের সাথে সম্পাদকের মতের কোনো মিল ছিল না।

পরিশেষে বলা যায় যে, *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় তৎকালীন সময়ের নারী বিষয়ক অনেক ধরনের খবর প্রকাশ পায়। তবে তুলনামূলকভাবে নারী নির্যাতনমূলক খবরের প্রাধান্য দেখা যায়। নারীদের সামাজিক অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। ঘরে, বাইরে সকল জায়গাতেই নারীরা অনিরাপদ ছিল যা এই অধ্যায়ের নারী অপহরণ এবং ধর্ষণের মতো খবর থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তবে এই পত্রিকা

[৮৪] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৭২-১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের শুধু নেতিবাচক খবরই নয় অনেক ইতিবাচক খবরও তুলে ধরেছে। শিক্ষা ও রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। নারীদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়েও অনেক প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। পত্রিকায় নারী বিষয়ক অনেক প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনও দেয়া হতো সে সময়। এই পত্রিকার নারী বিষয়ক খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পত্রিকার পাতায় স্থান পেয়েছে। পত্রিকার মালিকানায় যারা থাকতো তারা নারীদেরকে তাদের মতো করে মূল্যায়ন করতো। তাদের মনোভাব উদার হলে উদারনৈতিক মনোভাব প্রকাশ পেত অপরদিকে রক্ষণশীল হলে সেটিও প্রকাশ পেত। খবরের বিভিন্নতায় *ঢাকা প্রকাশে* নারী বিষয়ক খবরগুলো ছিল বৈচিত্র্যময়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা তৎকালীন সময়ের (১৮৬৩-১৯৫৯) সালের ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস জানার জন্য একটি মহামূল্যবান উৎস হওয়ার যোগ্যতা রাখে। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় সমকালীন অন্যান্য সংবাদের পাশাপাশি সুদীর্ঘকাল ধরে নারীর জীবনের বিভিন্ন দিকও উঠে এসেছে গুরুত্বের সাথে। সেগুলোর মধ্যে নারী নিয়ে বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা, তাদের জীবনপ্রণালি ও সংস্কৃতি অন্যতম। এত প্রাচীন পত্রিকা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে প্রায় দেড়শ বছর আগের সেই ঢাকার নারীদের চিত্র। যা আমি পত্রিকার আলোকে এবং আমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই অভিসন্ধর্ভে। অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে তৎকালীন সময়ের ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছি।

প্রথমেই সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি নারীর সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে। সংস্কৃতির সাথে আবার আধুনিকতাও বহমান। এই আধুনিকতা ও উন্নয়নের অন্যতম বিষয় হিসেবে নারী ও পুরুষের মধ্যকার রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আর নারী-পুরুষের সম্পর্কের সাথে জেন্ডার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জেন্ডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নারী। সময়ের পরিক্রমায় নারী বিষয়ক আলোচনাগুলো গবেষণায় গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। নারীর ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সব দেশের নারীরাই সামাজিকভাবে খুব খারাপ অবস্থানে ছিল। নারীদের এই করুণ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সর্বপ্রথম নারীরাই এগিয়ে আসেন তাদের বিপ্লবী লেখনীর দ্বারা। তাদের মধ্যে ফরাসি লেখক ক্রিস্টিন দ্য পিজান অন্যতম। ১৪০২ সালে এ বিষয়ে তার প্রথম লেখনী প্রকাশ পায়, পরবর্তীতে ১৪০৫ সালে তিনি আরেকটি গ্রন্থ লেখেন যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে নারী জাগরণ শুরু হয়ে যায়। তার গ্রন্থের নাম ছিল *The Book of the City of ladies*. যেখানে নারীদের সক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করা ছিল। তার হাত ধরে নারীরা তাদের দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য উপায় খুঁজতে থাকে। ঢাকার নারী সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার নারীরা কেমন ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে। অবরোধের বেড়াজালে বন্দি ছিল উনিশ শতকের বাঙালি নারীরা। তাদের এই বন্দি জীবনের গল্প নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে একটা সময়, যেগুলো স্থান পেয়েছে সমসাময়িক পত্রপত্রিকায়। তেমনি একটি অন্যতম পত্রিকা হচ্ছে *ঢাকা প্রকাশ*। যেখানে উঠে

Dhaka University Institutional Repository

এসেছে নারী বিষয়ক অনেক অজানা তথ্য। *ঢাকা প্রকাশ* যেহেতু ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা তাই এখানে *ঢাকা প্রকাশের* পরিচয় দেওয়ার আগে ঢাকার পরিচয় দেয়া হয়েছে এবং *ঢাকা প্রকাশে* প্রতিফলিত ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্য, সময়কাল, গবেষণা পদ্ধতি এবং যৌক্তিকতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে *ঢাকা প্রকাশের* পরিচয় ও নারী প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি এই পত্রিকার যাত্রা কিভাবে হয়েছিল এবং পত্রিকাটির সম্পাদনার সাথে কারা জড়িত ছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকার নাম *ঢাকা প্রকাশ।* শুরুতে ব্রাহ্মধর্মমত প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকাটির যাত্রা হলেও পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে এটি এত বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, প্রায় একশ বছর ধরে স্বগৌরবে টিকে থাকে। শুরুতে ব্রাহ্মদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পরবর্তীতে রক্ষণশীল হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে যায় পত্রিকাটি। দীর্ঘদিন ধরে তাদের হাতে এর দায়িত্ব থাকে। একদম শেষের দিকে মুসলমানদের কাছে পত্রিকার দায়িত্ব যায়। শেষ সম্পাদক ছিলেন আব্দুর রশিদ খান। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কারণে পূর্ব বাংলা মুসলমান অধ্যুষিত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশ বিভাগের ফল পত্রিকার মালিকানা পরিবর্তনের মধ্যেও দেখা যায়। পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য মুদ্রণযন্ত্র প্রয়োজন হয়। *ঢাকা প্রকাশ* এর সাথে যে মুদ্রণযন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটি হচ্ছে বাঙ্গালা যন্ত্র। ঢাকার ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল এই মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমে। এখান থেকে শুধু *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকাই নয় অনেক বইপত্রও মুদ্রণ করা হয়েছিল। বাঙ্গালা যন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে কারা জড়িত তাদের পরিচয়ও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ব্রাহ্মধর্মমত প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এ যন্ত্রটি প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, কারণ তারা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় এই প্রেস থেকে যৌথ মালিকানায় পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িকপত্র মাসিক *মনোরঞ্জিকা* প্রকাশ হলেও কিছুদিন পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা আরেকটি পত্রিকা প্রকাশে বদ্ধপরিকর হয়ে ১২৬৭ সালের ২৬ ফাল্গুন বৃহস্পতিবারে *ঢাকা প্রকাশ* নামক এক কালজয়ী পত্রিকার জন্ম দেন।

পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ধারাবাহিকভাবে যারা দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘদিন ধরে তারা হলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দীননাথ সেন, জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী, গোবিন্দ প্রসাদ রায়, অনাথবন্ধু মৌলিক, পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ চন্দ্রনাথ ,গুরুগঙ্গা আইচ, শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী বিএ এবং রাধারমন ঘোষ। মুসলমান সম্পাদক হিসেবে শেষ সময়ে আব্দুর রশীদ খান পত্রিকার গঠনগত বেশকিছু পরিবর্তন সাধন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা প্রকাশের আলোকে তৎকালীন ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় দিতে চেষ্টা করা হয়েছে এরপর। মূলত কোনো স্থানের মানুষের আচারব্যবহার, জীবিকার উপায়, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয় তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সাথে আমার আলোচ্য ঢাকা শহরের ইতিহাসও তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকা এমন একটি শহর যেখানে হাজারও সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বিভিন্ন সময়ে রাজধানীর মর্যাদা পাওয়ায় সব সময়ই এই শহরের গুরুত্ব ছিল। যে কারণে দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সকলেই ছুটে আসতো এই রাজধানী শহরে। ফলশ্রুতিতে ঢাকার সংস্কৃতি একটি জটিল ও মিশ্র সংস্কৃতি রূপে রূপান্তরিত হয়েছিল। সংস্কৃতির রূপ হচ্ছে বহুমাত্রিক। কোথাও নিরাকার আবার কোথাও সে আকৃতিপূর্ণ। আর এই সংস্কৃতির সাথে সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকে নারী জাতির সম্পর্ক বিদ্যমান। যুগে যুগে কালে কালে সংস্কৃতিচর্চা নারীদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয়েছে। ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস এই অধ্যায়ে বিশদভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের রীতিনীতি, অভ্যাস, লোকসংস্কৃতি পালন, তাদের পারিবারিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, সতীদাহ প্রথার ফলে তাদের জীবনের করুণ অবস্থা, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, নাচ, গান, সংগীত ও নাটকে তাদের অবদান কিভাবে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সমাজে তারা কিভাবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পেরেছে সকল কিছুই এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে।

সবশেষে *ঢাকা প্রকাশে* নারী বিষয়ক খবরের ধরন কেমন ছিল, এর বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াসে এই বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। *ঢাকা প্রকাশে* নারী বিষয়ক কি ধরনের খবর প্রকাশ হয়েছে সেটার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। পত্রিকার সাথে নারীর সম্পর্ক তিন ভাবে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যেমন- অংশগ্রহণকারী কর্মী অথবা লেখক হিসেবে, পাঠিকা হিসেবে এবং উপস্থাপিত বিষয় হিসেবে। পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নারীরা, পত্রিকা পাঠ করার মাধ্যমেও তাদের সাথে পত্রিকার সম্পৃক্ততা ঘটে আর পত্রিকায় উপস্থাপিত বিষয় হিসেবে নারীর সাথে পত্রিকার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় নারী উপস্থাপিত বিষয় হিসেবে কিভাবে স্থান পেয়েছে এই অধ্যায়ে সেগুলোই বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঢাকা প্রকাশের নারী বিষয়ক খবরগুলোর অবস্থানগত বিষয় বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নারী বিষয়ক খবরগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় কখনো স্থান পায়নি এমনকি শেষ পৃষ্ঠায়ও না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাঝের পৃষ্ঠার ভেতরের কোনো কলামে খুব ছোট পরিসরে

Dhaka University Institutional Repository

খবরগুলো ছাপা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো স্থানে দুই বা তিন কলাম জুড়ে থাকলেও কখনোই প্রথম বা শেষ পৃষ্ঠার সংবাদ নারীরা হতে পারেনি। পত্রিকায় সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায়, একটু কম গুরুত্বপূর্ণ খবর শেষ পৃষ্ঠায় এবং ক্রমান্বয়ে তারপরে মাঝের পৃষ্ঠাগুলোতে সংবাদ ছাপা হয়। সে দিক বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছানো যায় যে, খুব গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম নারীরা কখনো হয়নি। একদিকে যেমন পত্রিকাটি খুবই নগণ্য পরিমাণ জায়গা নারী বিষয়ক খবরের জন্য ব্যবহার করেছিল অন্যদিকে নারী বিষয়ক খবরগুলো ভালো মূল্যায়নও পায়নি। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে দেখা গেছে সংবাদপত্রে দেশের নারীর পাশাপাশি বিদেশের নারী বিষয়ক খবরও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা উদাহরণসহ পত্রিকার আলোকে বোঝাতে এবং তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজে নারীরা কতটা অনিরাপদ ছিল এবং তারা কতটা ঘৃণ্যভাবে অপহৃত এবং ধর্ষিত হতো সে সময়েও এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। *ঢাকা প্রকাশে* অসংখ্য নারীনির্যাতনের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। পারিবারিকভাবেও তারা অনেক নির্যাতনের শিকার হতো। পত্রিকায় সাধারণ নারীদের পাশাপাশি বাড়বনিতা নারীদের তথ্যও উঠে এসেছে। নারীর স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং ঔষধসংক্রান্ত অনেক তথ্য এই পত্রিকায় উপস্থাপিত হয়েছে। তাদের স্বাস্থ্য ছিল অবহেলিত এবং বাল্যবিবাহের কারণে অসংখ্য নারী এক্লেমশিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আঁতুড় ঘরেই মৃত্যুবরণ করতো। নারীদের অসংখ্য রোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় পত্রিকা থেকে। যে রোগগুলা হয়েছিল বাল্যবিবাহজনিত কারণে। জরায়ুর রোগই ছিল নারীদের অধিক পরিমাণে। এ রোগ থেকে মুক্তির জন্য দীর্ঘ অনেক বছর ধরে বিভিন্ন ঔষধের বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। নারীরা তখন চাইলেই ডাক্তারের কাছে যেতে পারত না তাই তাদের এ সকল অসুখ বিসুখ থেকে মুক্তির জন্য পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেওয়া ঔষধগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। এলোপ্যাথিকের পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, বিভিন্ন কবিরাজি চিকিৎসারও বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো। **স্ত্রীরোগে অশোক** একটি বহুল প্রচারিত ঔষধের বিজ্ঞাপন হিসেবে পরিচিত। **সুবাহু ঘৃত** নামেও ঔষধের বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা নারীর প্রসাধনের অনেক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। সেগুলোর মধ্যে তেলের বিজ্ঞাপনই সর্বাধিক সংখ্যায় প্রচারিত হয়েছে। যেমন- **ফুলেলা, কেশরঞ্জন তেল, লাবণ্যপ্রভা তেল** ইত্যাদি।

রক্ষণশীল হিন্দুদের সময় থেকে বিজ্ঞাপনে নারীচিত্রের সূচনা হয়। সেখানে নারীকে বেশ আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হতো। খোলা চুলে আকর্ষণীয় গঠনে, কখনো ব্লাউজবিহীন শাড়িতে

Dhaka University Institutional Repository

আবার কখনো ব্লাউজসহ শাড়ি পরিহিতা অবস্থায় নারীকে প্রদর্শন করা হতো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে। পর্দা প্রথার যুগেও নারীদেরকে এভাবে উপস্থাপন করা হতো পত্রিকায়। পরবর্তীতে নারীরা ধীরে ধীরে পর্দা প্রথার নিকট থেকে মুক্তির আশায় বাইরের দুনিয়ায় পদার্পণ করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। যার প্রমাণ দেখা যায় বঙ্গভঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। পুরুষরা এক্ষেত্রে নারীদেরকে প্রভাবিত করেছিল। কারণ নারীদের সমর্থন ছাড়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সফল করা সম্ভব ছিল না। নারীরা নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে শুরু করে, যার ফল হিসেবে পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন সভা সমাবেশ করার মতো সক্ষমতা প্রদর্শন করে।

ঢাকা প্রকাশ থেকে নারী শিক্ষা বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কখনো পত্রিকা নারী শিক্ষার বিপক্ষে মতামত তুলে ধরেছে আবার কখনো পক্ষে মতামত তুলে ধরেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং প্রতিবেদন থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে সমকালীন ভাবনাচিন্তা, তাদের শিক্ষার উন্নয়নে কি কি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, কোন ধরনের শিক্ষাকে ও কেন উপযুক্ত বলে এবং সরকার কর্তৃক নারীদের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীদের জন্য কোনো ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি-না এ সকল কিছুই এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীরা কিভাবে অন্তঃপুর শিক্ষা থেকে বের হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে সেই তথ্য পত্রিকা থেকে এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, *ঢাকা প্রকাশ* প্রায় একশ বছর ধরে তাদের তুমুল জনপ্রিয়তা ধরে রাখলেও শেষের দিকে দেশ বিভাগজনিত কারণে আর্থিক অনটনে পড়ে। তাই এ সময়ে শুধু নিলামের ইশতেহারই প্রকাশ পায় পত্রিকা জুড়ে। ১৯৫৯ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটির তারিখ ১২ এপ্রিল, ১৯৫৯ খ্রি.। পূর্ব বাংলার অর্থাৎ ঢাকার যেকোনো বিষয়ের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে হলে এই পত্রিকা ছাড়া পূর্ণতা পাওয়া সম্ভব না। সেদিক বিবেচনা করেই আমি ঢাকার নারীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস রচনা করতে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকাকে বেছে নিয়ে ইতিহাস উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালিয়েছি। এই গবেষণাপত্রটি ভবিষ্যতের গবেষকদের ইতিহাস অনুসন্ধানে কোনো কাজে আসলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস

বিভিন্ন আর্কাইভে সংরক্ষিত সরকারী দলিল ও প্রকাশনা

1. Proceedings of the Government of East Bengal and Asam, PWD (building), 1907.
2. General Proceedings (Medical Department), 1871.
3. Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Asam during the years 1907-1908.
4. Report on the Survey Operation in Bengal, 1852-78, Calcutta.
6. Allen, B. C. Bengal District Gazerreers; Dacca, Allahabad: The pioneer Press 1912.
7. Clay, Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca. Division, Calcutta, 1868.
8. Report of the Government of Bengal to Revise the Salaries of Ministerial Offices, and to Reorganise the System of Buisness in Executive Offices 1885- 1886, Calcutta, 1886.
9. Proceedings of the Government of Bengal in the Department, January 1865.
10. Report on Native Papers, 1879.
11. Report on the Administration of Bengal, 1972- 73.
12. Report on the Administration of Bengal, Calcutta, 1971 -72, 1873 -74; F.H.B. Skrine. Memorandum on the Material condition of the Lower Orders in Bengal during the ten years from 1881- 82 to 1891-92, Calcutta, 1892.

12. A Summary of Reports from Various Social Reform Association in India for the Year 1900, Bombay, 1900.
13. Report on Native Papers, Calcutta, 1880
14. Report in the Administration of Bengal, 1871-72-1899-1900.

Dhaka University Institutional Repository

15. Report of the 10th National Social Conference held in Calcutta (1897), poona, 1897.
16. Report on the Administration of Bengal, 1877-78.
17. Report in Native Papers, Calcutta, 1890.

সংবাদপত্র এবং জার্নাল

ইংরেজি সংবাদপত্র

1. *The Dhaka News (1856- 1858)*
2. *The Bengal Times (1876-1886)*

বাংলা সংবাদপত্র

১. *ঢাকা প্রকাশ (১৮৬৩-১৯৫৯)*
২. *বঙ্গদর্শন (১৮৭২)*
৩. *ভারতী (১৮৭৭)*
৪. *সবুজপত্র (১৯১৪)*
৫. *কল্লোল (১৯২৩)*
৬. *লাঙল* (১৯২৫)
৭. *পূর্বাশা (১৯৩৭)*

দ্বৈতয়িক উৎস (সহায়ক রচনাবলি/অন্যান্য উৎস)

ইংরেজি গ্রন্থাবলি

Ahmed, Sharif Uddin (ed.), (2009). *Dhaka Past Present Future,* Dhaka : Assiatic Society of Bangladesh.

Amin, Sonia Nishat (1996). *The World of Muslim Women in Colonial Bengal*, 1876-1939, New York : E.J. Brill.

Borthwick, Meridith (1984). *The Changing Role of Women in Bengal*, 1849- 1905, USA : Princeton University Press.

Dani, Ahmed Hasan (2009). *Dacca*: *A Record of its Changing Fortunes,* Dhaka : The Asiatic Society of Bangladesh.

Hossain, Syud (2001). *Echoes from Old Dacca,* Dhaka : Hakkani Publishers.

Dhaka University Institutional Repository

Rahman, M Abdur (1969). *An Appraisal of Census Population of East Pakistan from 1901 to 1961,* Dacca : University of Dacca.

Rizvi, S.N.H (ed.), (1975 rep). *Bangladesh District Gazetter,* Dhaka.

Sufia Ahmed, (1974). *Muslim Community in Bengal 1884- 1912*, Dhaka : The University Press Limited.

Taifoor, Syed Muhammed (1956). *Glimpses of Old Dhaka*, Dacca : S. M. Perwez.

বাংলা গ্রন্থাবলি

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন (২০০৬). *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০ – ১৯২১)*, ঢাকা : একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি (এপিপিএল)।

— (সম্পা.) (২০০৭), *নগরায়ন এবং নগর সংস্কৃতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

আনিসুজ্জামান (১৯৬৯). *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ১৮৩১- ১৯৩০*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

আমিন, সোনিয়া নিশাত (২০০২). *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন ১৮৭৬ থেকে ১৯৪৯* পাপড়ীন নাহার (অনু.), ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

— (২০১০). *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

আলম, তাহমিনা (১৯৯৮), *বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

ইসলাম, মাহমুদা (২০০৫) *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*, ঢাকা : জে কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স।

ইয়াসমিন, ফিরোজা (সম্পা.) (২০১০). *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ প্রবচন কৌতুক ছড়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

ওয়াইজ, জেমস (২০০২). *পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, তৃতীয় খণ্ড, ফওজুল করিম (অনু.), মুনতাসির মামুন (সম্পা.), ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

করিম, আব্দুল (১৯৯৪). *মুঘল রাজধানী ঢাকা*, মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ সিদ্দিকী (অনু.) ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

— (২০০৩). *মুঘল রাজধানী ঢাকা*, সিদ্দিকী, ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ (অনু.) ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

কাদের, রোজিনা (২০০৪), *ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা : সুবর্ণ প্রকাশনী।

চৌধুরী, শামীমা (২০০৮). *সংবাদ মাধ্যমে নারী, পথ চলায় বাধা কোথায়*, ঢাকা : নিরীক্ষা, মার্চ -এপ্রিল, ২০০৮।

পারভীন, শায়লা (২০১৮). *উনিশ - বিশ শতকে পুরনো ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

ফিরোজ, এম, এ, হান্নান (সম্পা.) (২০০৯). *ঢাকার ৪০০ বছর*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

বেগম, মালেকা ও হক, সৈয়দ আজিজুল (২০০১). *আমি নারী, তিনশত বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

মামুন, মুনতাসির (১৯৭৭). *ঢাকা প্রকাশ ও পূর্ব বাংলার সমাজ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

— (২০১৯). *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র (১৮৪৭- ১৯০৫)* ৩য় খণ্ড, ঢাকা : অনন্যা।

Dhaka University Institutional Repository

— (২০১১). *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা : অনন্যা।

— (২০১৮). *আত্মস্মৃতিতে পূর্ববঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

— (২০২০). *আত্মস্মৃতিতে পূর্ববঙ্গ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

— (২০০৩). *ঢাকা সমগ্র* ১, ঢাকা : অনন্যা।

— (২০০৪). *ঢাকা সমগ্র* ২, ঢাকা : অনন্যা।

— (২০০৫). *ঢাকা সমগ্র* ৩, ঢাকা : অনন্যা।

— (২০০৬). *ঢাকা সমগ্র ৪*, ঢাকা : অনন্যা।

— (২০১০). *ঢাকা সমগ্র ৫*, ঢাকা : অনন্যা।

— (২০১৫). *ঢাকা সমগ্র* ৬, ঢাকা : অনন্যা।

— (২০১৮). *উনিশ শতকে বাংলা সংবাদ সাময়িক পত্র*, ঢাকা : অনন্যা।

— (২০০৬). *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা : সাহিত্য বিলাস।

— (২০০৪). *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : অনন্যা।

— (২০১০). *ঢাকার স্মৃতি* -৯, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

— (২০০৯). *ঢাকা স্মৃতি বিস্তৃতির নগরী*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : অনন্যা।

— (২০০৬). *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র, (১৮৪৭- ১৯০৫)*, নবম খণ্ড, ঢাকা : অনন্যা।

মুরশিদ, গোলাম (২০০৬). *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা।

— (১৯৮৫). *সংকোচের বিহ্বলতা আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণীর প্রতিক্রিয়া*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

সেন, আশালতা (২০০৫). *সেকালের কথা*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ।

সুলতানা, আরিফা (২০২৩). *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা।

হোসেন, মোঃ মোশারফ (২০১১). *শহরের নাম ঢাকা ঐতিহ্যের নাম ঢাকা*, ঢাকা : পড়ুয়া।

হায়াত, অনুপম (২০০১). *পুরনো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

— (২০১৩). *গণমাধ্যম ও নারী*, ঢাকা : সমাচার প্রকাশনী।

— (২০০১) *নওয়াব পরিবারের ডায়েরীতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, চট্টগ্রাম- ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.।

হক, মাহমুদ শামসুল (২০০০). *হাজার বছরের বাঙালি নারী*, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৯৯৮). *অবরোধবাসিনী*, ঢাকা : নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা।

রহমান, হাকিম হাবিবুর (২০০৫). *ঢাকা পাচাশ বারাস পহেলে: ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে*, মোহাম্মদ রেজাউল করিম (অনু.), ঢাকা : প্যাপিরাস।

রফিকুল ইসলাম, (২০০১). *ঢাকার কথা ১৬১০- ১৯৪৭*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস।